গাধা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

গাধা

আমার স্ত্রীর নাম রেখেছি ডাকিনী আর শালীর নাম রেখেছি যোগিনী। আমি রেখেছি। বাপ-মা অবশ্য অন্য নাম রেখেছিলেন। ছেলে মেয়েদের নাম রাখা হয় সাতসকালে। তখন সব জড়পিণ্ড। অয়েল ক্লথের ওপর কাঁথা, কাঁথার ওপর ঘুনসি কোমরে, লেংটি পরা আমার বউ। শ্বশুরমশাই সোহাগ করে অভিধান ঘেঁটে নাম রাখলেন, মধুমতী। তিনি যেই ধেড়ে হলেন, কোথায় তাঁর মধু, আর কোথায় সেই মতি! ভুল সংশোধন পরীক্ষার খাতায় চলে, জীবনখাতা ভোটের আঙুল, সে কালির ফোঁটা সহজে মোছে না।

তেরাত্তির পেরোতে না পেরোতেই, মধুমতীর হাঁক-ডাক শুরু হয়ে গেল। সোহাগের ভিটামিন, সংসারের প্রোটিনে সেই হাঁকা-হাঁকি, ডাকাডাকি মটোর গাড়ির হর্নের মত আটকে গেল। কি কি সারে না?

বাত সারে না।
দন্তশূল সারে না।
পায়ের কড়া সারে না।
আমাশা সারে না।
পাগলামি সারে না।
ছুঁচিবাই সারে না।

না সারলে সরে পড়ার তো উপায় নেই। মানুষ তো আর শেয়াল নয়, যে দ্রাক্ষাফল টক বলে গাছতলা থেকে সরে পড়বে। বউ টক হলেও যার বউ তার কাছে ভারি মিষ্টি। যেমন দেশ। গোভাগাড় হলেও গাইতে হবেঃ

এমন দেশটি কোথাও খুঁজে
পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে…।

তাই আদর করে নাম রেখেছি—ডাকিনী। আরও আদরে

ডাকু। যখন খুব উত্তেজিত, ঝাড়ফুঁকের চোটে তিড়বিড় অবস্থা, তখন বুকের পাটা চাবড়ে গান ঃ

ডাকিনী, যোগিনী, এল শত নাগিনী
মুক্তির মন্দির সোপান তলে
কত প্রাণ হল বলিদান
ড্যাম্পোর ড্যাম্পোর ড্যাম ॥

শ্বশুরমশাই বড় মেয়ের সঙ্গে নাম মিলিয়ে আমার সুইট শ্যালিকার নাম রেখেছিলেন, অনুমতি। হনুমতি রাখেননি, এই তার বাপের ভাগ্যি। সেই মেয়ের যে কি হল! শালী মানেই সুইট। আমের যেমন জাত। ল্যাংড়া, হিমসাগর, বোম্বাই, আল-ফানসো, কোহিনুর। শালীরা সব ওই জাতের আম। পাতলা খোসা। পিসবোর্ডের মত আঁটি। যেমন মিষ্টি, তেমনি গন্ধ। তেমনি তার শাঁস। দাঁত বসে যাচ্ছে, যাচ্ছে তো যাচ্ছেই, আঁটির পাত্তা নেই। একেবারে হাপুস-হুপুস অভিজ্ঞতা।

আর স্ত্রীরা সব বাঘা তেতুঁলের জাত। কামরাঙা। মাছরাঙা হলেও বোঝা যেত। মানুষের এমন পোড়া কপাল শালীরা কিছুতেই স্ত্রী হবে না। একই শ্বশুরমশাই। ভুলেও বলবেন না, বাবাজীবন, এই নাও, প্রথম থেকেই শালীটিকে স্ত্রী করে নিয়ে যাও। জীবনে তোমার আর কোন ইয়ে থাকবে না। পলিটিকস আর কাকে বলে? ঝুলি ঝেড়ে ঠিক স্ত্রীটিকেই ঘাড়ে গছিয়ে দেবেন। সঙ্গে ওই সব গদার মতো, মাথার বালিশ, কোল বালিশ না দিয়ে একটা নুনকল দিলেও বোঝা যেত। টক মেরে থাও। বউ যেন মালদার ইয়া এক ফজলি।

আমার সুইট শালী, আমার হৃদয়ের ধুকপুকির কি যে হল! কোন শালা যে চোট মেরে দিল। আমি দেখেছি, যাদের স্ত্রীরা সুখী, তাদের শালীরা প্রায়শই অসুখী। বিধির বিধান। দুঃখে বুক ফেটে যাবে, অথচ করার কিছুই থাকবে না। 'আহা' করেছ কি মরেছ। স্ত্রী অমনি বলবেন, 'অঃ, শালীর দুঃখে বুক একেবারে মুচড়ে উঠল। ভাবো, বুঝি না কিছু! ঘাসে মুখ দিয়ে চলি, তাই না? কই আমার দুঃখে তো নড়ে বসার লক্ষণ দেখি না। অত পিরিত কিসের! অত পিরিত! বেশি নটরঘটর করেছ

কি, দেবো গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন। তখন বুঝবে ঠেলা। স্ত্রী হত্যার দায়ে ঘানি ঘোরাবে।'

তা অবশ্য ঠিক। স্ত্রী এখন জনগণের। গায়ে আঁচড় লাগলেই প্রথমে গণধোলাই, অন্তে আদালত। তিনি আঁচড়াবেন, তিনি কামড়াবেন। তিনি চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করবেন। তিনি মাকে কাশীবাসী করাবেন। আত্মীয়-স্বজন থেকে স্বামীকে পৃথক করাবেন। হামানদিস্তেতে ফেলে থেঁতো করবেন। সামান্যতম প্রতিবাদ চলবে না। স্ত্রীর পাঁঠা হয়ে আমৃত্যু ব্যা-ব্যা করতে হবে। তিনি পরের মেয়ে, তাই মাথায় করে রাখতে হবে শালগ্রাম শিলার মতো। আর আমি যে পরের ছেলে, আমাকেও যে একটু ইয়ে করা উচিত, সে কথা জনগণ, কি ড্যাঙোশধারী নগর কতোয়াল, এমন কি শামলাধারী ধর্মাবতার, কেউই মানতে চাইবেন না। যার শিল, যার নোড়া, তারই ভাঙি দাঁতের গোড়া, এই নীতি চলছে চলবে।

যদি বলি, 'তোমারই তো বোন, তার প্রতি একটু সহানুভূতি…।'

সহানুভূতি! সহানুভূতি! চোখ গোল গোল হয়ে গেল, দাঁত কিড়মিড়, ফোঁসফাঁস নিশ্বাস।—সহানুভূতি! কই, তোমার মেজশালার ফ্যাক্টরিতে ধর্মঘট চলছে। বছর ঘুরে গেল, হাঁড়ি চড়ছে না, তার ওপর তো কোনও সহানুভূতি নেই। কেন নেই মানিক ?'

তারপর বিশ্রী সব ইঙ্গিত। শালার গোঁফ আছে শালীর গোঁফ নেই। শালার এই নেই শালীর ওই আছে। ব্যাপারটাকে এমন এক জায়গায় নিয়ে গেল, এমন একটা অশ্লীল স্তরে, যেখানে ধুস্ শালা ছাড়া আর কিছু বলার থাকে না।

সেকালে তরজা গাইত জাঁদরেল, জাঁদরেল সব মহিলা। ক্ষান্তমণি দাসী, ভামিনী মাসী। জর্দা দিয়ে দুখিলি পান মুখে পুরে কর্কশ গলায় ঢোল আর কাঁসির সঙ্গতে, সে এক ফাটাফাটি ব্যাপার। আসরের তরজা, একালে বাসর ঘরে, শোবার ঘরের খাটে।

যদি বলি, 'তুমি ভালগার।'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর, 'তুমি স্মাগলার।'

যদি বলি, 'মনটাকে উঁচু করো।'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর, 'লব বৃন্দাবনটা তাহলে জমে ভালো।'

'বৃন্দাবনের দেখলেটা কি!'

'বাঁশি আর গরু ছাড়া সবই দেখছি। রাধিকের নৃত্য, বস্ত্রহরণ, মানভঞ্জন, মাথুর, মোলায়েম খেউড়, অধরের তাম্বুল, মাঝ রাতে পা টিপে টিপে এ ঘর থেকে ও ঘরে অভিসার। ঝ্যাঁটা মার, ঝ্যাঁটা মার।'

মানুষ কেন পাপের পথে পা বাড়ায়!

আমি একটা থিসিস লিখতে পারি।

স্ত্রীর সন্দেহই মানুষকে পাপের পথে ঠ্যালে। মনে আছে সেই গল্প, 'পাগলা সাঁকো নাড়াসনি।' স্কুল ইনস্‌পেক্টর গ্রামে এসেছেন স্কুল পরিদর্শনে। হেডমাস্টার তাঁকে নিয়ে সাঁকো পেরচ্ছেন। নড়বড়ে সাঁকো। মাঝামাঝি এসে চোখে পড়ল গ্রামের সেই পাগলাটা সাঁকোর ও মাথায় দাঁড়িয়ে আপন মনে বিড়বিড় করছে। হেডমাস্টার মশাইয়ের মাথা ঘুরে গেল, সর্বনাশ! সাঁকোটা ধরে পাগলা যদি নাড়া দেয়, নির্ঘাৎ জলে। হেঁকে বললেন, 'ওরে পাগলা, সাঁকোটা নাড়াসনি।' ব্যস, আর যায় কোথায়। পাগলা সাঁকো ধরে নাড়া দিলে। দুজনেই জলে।

স্ত্রী হল সেই সাবধানী হেডমাস্টার। আর স্বামী হল সেই গ্রামের পাগলা। আর খাল হল সেই শালী।

আমার মনে সত্যিই কোনও পাপ ছিল না। ফুলের মতো একটা মেয়ে ক্যাডাভারাস একটা লোকের পাল্লায় পড়ে যৌবনে যোগিনী হয়ে যাচ্ছে। কোনও আপনজনের তা সহ্য হয়! আমার পক্ষে ঠিক ততটা স্বার্থপর হওয়া সম্ভব নয়। ছেলেবেলায় সেই যে একবার পড়েছিলুম, 'পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি, এ জীবন মন সকলি নাও।' সে একেবারে মনে গেঁথে গেছে। রোজগার-পাতি নেহাত খারাপ করি না, একটা 'রেচেড সোল' তার মুখে হাসি ফোটাতে পারব না। কিসের জন্য জন্মেছি! কেন এ জীবন! ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'ওরে তুই বটবৃক্ষ হবি। তোর ছায়ায় কত লোক এসে বসবে।' আমি সেই বটবৃক্ষ। সেই

বৃক্ষতলের বাঁধানো বেদীতে একটি মেয়ে এসে বসেছে। সেই মেয়ে হল, আমার শালী, অনুমতি। আর সেই বটের ডালে একটি কাক, আমার স্ত্রী হনুমতী। মধুমতী আর বলতে ইচ্ছে করে না। সেই কাক অনবরত অনুমতির মাথায় বিষ্ঠা ত্যাগ করে চলেছে।

হিংসা! হিংসায় একেবারে মরে যাচ্ছে। পৃথিবীতে এত সব বড় বড় জিনিস আবিষ্কার হচ্ছে, নানা রোগের নানা ওষুধ। হিংসে কমাবার না কোনও অ্যালোপ্যাথি, না কোনও হোমিও-প্যাথি ওষুধ আজও আমাদের হাতে এল না। নির্মল করো, মঙ্গল করো, গাহিলেই কি আর নির্মল হওয়া যায়, না মঙ্গল নেমে আসে।

আমি ছিলুম সহজ, সরল, বোকা, হাঁদা। ক্রমশই চালাক চতুর বুদ্ধিমান হয়ে উঠতে লাগলুম। অভিনয় করতে শিখলুম। আমার মনে এক, আমার মুখে এক। এমন একটা ভাব দেখাতে শুরু করলুম, যেন মধুমতী ছাড়া আমার জীবন অচল। দিনে অন্তত বার কয়েক বলতে লাগলুম, 'অনুমতি কবে এখান থেকে সরবে বলতে পারো? আর তো পারা যায় না।'

আমার এই কথায় মধুমতী প্রথম প্রথম বাঁকা হাসত, আর বলতো, 'খাল কেটে কুমির তো নিজেই এনেছ। কবে যাবে, কত দিন থাকবে, সে তো তুমিই জানো।'

'আর পারা যায় না। সারা দিন সেজেগুজে পটের বিবিটি হয়ে বসে আছে।'

'তোমার আদরে।'

'আমার আদর। ওকে দেখলে আমার গা জ্বালা করে।'

আমার অভিনয়ে কোনও খুঁত ছিল না। ফলে মধুমতী একদিন টোপ গিলল। বললে, 'পিরিত তাহলে চটকে গেল?'

কোনও কালেই আমার পিরিত ছিল না। আমার আকাশে একটিই মাত্র চন্দ্র। আর সেই চাঁদটির নাম মধুমতী।'

বিছানায় আমার আর মধুমতীর মাঝখানে বিশাল একটা পাশ বালিশ চীনের প্রাচীরের মতো ঢুকে পড়েছিল। বালিশটা হঠাৎ একদিন সরে গেল। মধুমতীর শাঁখা আর চুড়ি পরা হাত

আমার বুকে এসে পড়ল। পায়ে পা জড়াল। গালের পাশে গরম নিঃশ্বাস। স্বামী-স্ত্রী একেবারে ঝাড়া হাত পা। আমাদের কোনও ছেলেপুলে হয়নি। হবেও না। পরীক্ষা টরীক্ষা কয়েক প্রস্থ হয়ে গেছে। রিপোর্ট মোটেই আশাপ্রদ নয়। ঝামেলা আছে।

আমি শুয়ে শুয়ে মধুমতীর চুলে হাত বোলাই। ট্যাপা ট্যাপা গালে আঙুলের টোকা মারি। মধুমতী নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমিয়ে পড়ে। নাক ডাকতে থাকে। আর আমি জেগে জেগে ভাবি, এই হল মানুষের জীবন! সত্য বস্তুটি কি নির্মম! আমরা মিথ্যাকে সত্য ভাবি। যা নেই, তা আছে ভাবি। মানুষের মুখের কথাকে মনের কথা ভেবে নিশ্চিন্তে হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। ভাবতেই পারি না, রক্ষক ভক্ষক হতে পারে। ভাবতেই পারি না, প্রহরী আততায়ী হতে পারে। বিশ্বাস গিয়ে বিশ্বাস-ঘাতকতার পাঁচিলে মাথা কুটে ফিরে আসে। মাছে মতো নির্বোধ আমরা, খাদ্যকে খাদ্য ভাবি, বুঝতেই পারি না, ভেতরে আছে বঁড়শির ধারালো খোঁচা। অচ্ছেদ্য সুতোর শিকারী আকর্ষণ। বুঝতেই পারি না না সংসার এক খাঁচা।

মধুমতী ঘুমোয় আর আমি ভাবি। আমার মায়া হয়। প্রেম আসে। প্রেম থেকে আসে ঘৃণা। বয়েস হয়েছে। অনুমতির চেয়ে অন্তত বছর দশেকের বড়। মেয়েদের ক্ষেত্রে দশটা বছর বড় কম নয়। কথায় বলে, কুড়িতেই সব বুড়ি। মধুমতীর গাঁটে গাঁটে বাত। চুল পাতলা হয়ে এসেছে। চামড়ার চেকনাই কমেছে। যে সব জায়গায় যৌবন থাকে, সেই সব জায়গায় রাঁধুনি আলগা হয়ে এসেছে। অম্বল হয়। ঢেঁকুর তোলে। কোমরে মেদ এসেছে। দাঁতে পোকা লেগেছে। প্রায়ই সর্দি হয়। ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ হাঁচে। বিশ্রী কাশে। প্রায়ই মাথা ধরে। ফুর্তির কথা বললে ধর্ম শোনায়। সাজ-পোশাকে রুচি নেই। ফ্যাশান জানে না। সেকস শব্দটাই শোনে নি।

যত ভাবি তত দূরে সরতে থাকি। শরীরে শরীর ঠেকে আছে। বুকের ওপর পড়ে আছে শাঁখা-পরা গোল, শীতল একটি হাত। চাঁপার কলির মতো আঙুল। অথচ সমুদ্রের ব্যবধান। মাঝে মাঝে এখনও ভেবে বসি, আর কত বছর বাঁচবে! এত ব্যাধি

যার সে কেন মরে না, তাহলে এমন রাতে আমি অনুমতিকে পাশে রেখে পরমানন্দে। তার চুলে সুগন্ধ। বাতাসে ফুরফুর। তার দেহ অজানা বিস্ময়! নিজের মনের গতি দেখে নিজেই ঘাবড়ে যাই। এত পাপ! এত ভোগবাসনা?

দুনিয়াটা কি মজার? আমি স্বামী, আমি আমার স্ত্রীকে ভালবাসি না। অনুমতি স্ত্রী। সে তার স্বামীকে ভালবাসে না। আমি অনুমতির জন্যে হাপরের মতো ফোঁস ফোঁস করছি।

এক সময় মধুমতীর হাতটাকে বুক থেকে সরিয়ে দিয়ে পাশ ফিরে শুই। ঘুম আর আসে না। হঠাৎ বুকটা কেমন করতে থাকে। মনে হয় অন্ধকারে কে যেন পা ছড়িয়ে বসে কাঁদছে। সে হল আমি।

ছেলেবেলায় স্কুলে পড়ার সময় কে একবার আমার চুলে চিউইংগাম আটকে দিয়েছিল কিছুতেই খুলতে পারি না। শেষে চুল কেটে ফেলে দিতে হল। মধুমতী আমার সেই চিউইংগাম।

আমি একজনকে জানি যে আগে পরে পর পর তিন বোনকে বিয়ে করেছিল। তিন জনকে নিয়েই মহাদাপটে বীরের মতো ঘরসংসার করছে। আমার সঙ্কটের কথা তাকে জানাতে, বললে, 'কি আছে! এ নিয়ে এত ভাবার কি আছে। বিয়ে করে ফেল।'

তারপর ভেবে বললে, 'তোমার ব্যাপারটা সামান্য কম্‌প্লিকেটেড। তোমার স্ত্রী কেস করবে না, এ আমি লিখে দিতে পারি, তবে ঝামেলা করলেও করতে পারে তোমার শালীর বর। ওই তরফে আগে একটা ছাড়াছাড়ির ব্যবস্থা কর। পথ ক্লিয়ার করে বীরের মতো ঢুকে পড়।

মধুমতীর চোখের আড়ালে অনুমতির সঙ্গে আমার ভাব-ভালবাসা ঠিকই চলতে লাগল। অনুমতির তেমন কোনও আপত্তি বা প্রতিবাদও ছিল না। মনে হত সেও আমাকে চাইছে। কেউ কি একা বাঁচতে পারে? সকলেই সঙ্গ চায়, সঙ্গী চায়। পাপের একটা প্রবল আকর্ষণ আছে। যারা ধর্ম করে তারাও পাপ করে। যে মন্দিরে যায়, সে বেশ্যালয়েও যায়।

অনুমতির সঙ্গে বাড়ির বাইরেও মেলামেশার ব্যবস্থা ছিল। বেশ লাগত। সংসার পলাতক দুই চরিত্র। গেঁটে বাত, অম্বল,

মাথাধরার বাইরে, আকাশ বাতাস, লেক, পার্ক, গাছপালা, সিনেমা, থিয়েটারের জগতে সে এক মহামিলন। মনে হত বেঁচে উঠেছি। আরও বাঁচতে চাই।

একটা মেয়েকে হাত ধরে রাস্তা পার করাচ্ছি। পাশে বসে জড়িয়ে ধরে গাড়িতে করে চলেছি হু-হু করে। দামী রেস্তোরাঁয় বসে প্রিয় স্যুপের অর্ডার দিচ্ছি। সিনেমা হলে গায়ে গা লাগিয়ে বসে আছি। জীবন যেন কবিতা। মাঝে মাঝে মধুমতীর কথা মনে পড়ল। বাড়িতে একা। হয় শুয়ে আছে, না হয় ছাদে দাঁড়িয়ে আছে একা। পশ্চিমে সূর্য ঢলছে। ঝাঁক ঝাঁক পাখি বাসায় ফিরছে। মনটা কেমন করে উঠত। আর তখনই অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে অনুমতির হাতের মুঠি নিজের কোলে টেনে নিতুম। নিজের মাথাটাকে ঢলিয়ে দিতুম অনুমতির গাল ছুঁয়ে তার ঘাড়ে। ভাবতুম আমার যদি দ্বিতীয় একটা আস্তানা থাকত, তাহলে ছবি শেষ হয়ে যাবার পর অনুমতিকে নিয়ে সেখানে গিয়ে উঠতুম। হাতে থাকত সুস্বাদু কাবাবের ঠোঙা। পানীয়ের বোতল। ফুল কিনতুম। কিনতুম মালা। গজলের রেকর্ড চালিয়ে দিতুম। চাঁদ উঁকি মারত জানালায়।

একদিন অনুমতিকে খুব মদ খাওয়ালুম। নেশায় চুর হয়ে গেল। মুখ-চোখ লাল। শরীর দিয়ে যেন আগুন ছুটছে। বেশবাস সম্পর্কে অচেতন। মাঝে মাঝে খিল খিল হাসি। পাপের আনন্দে পাপ করে যাচ্ছি। তখন বুঝিনি আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে। অনুমতিকে বাড়ি ফিরতে হবে। আরও দাও, আরও ঢেলে যাও। যে লোকটা সার্ভ করছিল তার আর কি! সে তো আমাদের মর‍্যাল গার্জেন নয়। তাকে বলছি, সে দিয়ে যাচ্ছে। খালি গেলাসে একটা করে কাগজ গুঁজে দিয়ে যাচ্ছে। বিল? মুরগির ঠ্যাং চিবোচ্ছি। গেলাসে চুমুক দিচ্ছি। বিল বাড়ছে। রাত বাড়ছে। মেয়েটা উদ্দাম হচ্ছে। অসভ্য হচ্ছে। অসংলগ্ন হচ্ছে। আমি ভাবছি, শালবন, চাঁদের আলো, মাদল, স্ত্রী-পুরুষের নৃত্য।

বহুকাল আগে একটা ফরাসি ছবি দেখেছিলুম। বেশ মজার। একজনের বাড়ির সিঁড়িতে কারা যেন একটা লোককে

মেরে রেনকোট পরিয়ে দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখে গিয়েছিল। বইটার নাম ছিল, 'এ ম্যান ইন দি রেনকোট'। নায়কের ভূমিকায় ছিলেন, মরিস শেভালিয়ার। নায়ক সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে মৃত লোকটিকে দেখে, 'হু আর ইউ' বলে যেই ঠেলা মেরেছে, কাত হয়ে পড়ে গেল। তারপরই শুরু হল আসল মজা। নায়ক এইবার কি করে! কোথায় পাচার করবে মৃতদেহ? অনেক রাতে সবার অলক্ষে মৃতদেহটি রেখে এল প্রতিবেশীর দরজায়। সেই মৃতদেহ ঘুরতে ঘুরতে চলে এল আবার তার সিঁড়িতে।

অনুমতিকে নিয়ে রাস্তায় নামার সঙ্গে সঙ্গে খোলা বাতাসে আমার বোধবুদ্ধি আবার ফিরে এল। মনে পড়ল, আমার একটা বাড়ি আছে। আমাকে সেই বাড়িতে ফিরতে হবে। সেখানে আমার বউ মধুমতী আছে। বেশ রাত হয়েছে। নেশা হয়েছে। আমার শরীরে ভর দিয়ে অনুমতি হাঁটছে। ছেড়ে দিলেই পড়ে যাবে। কখনও গুনগুন করে গাইছে। মাঝে মাঝে যা-তা বকছে। অকারণে হাসছে। থেকে থেকে বসে পড়ার চেষ্টা করছে। ভাগ্য ভাল, পথে বিশেষ লোকজন নেই। একবার মনে হল, মাতাল অনুমতিকে ফুটপাথের একপাশে ফেলে রেখে চলে যাই। পাপের পরেই মানুষের হঠাৎ খুব ধার্মিক হতে ইচ্ছে করে। তিন চার ঘণ্টা অনুমতিকে চটকাচটকি করে আমার কৌতূহল মিটে গেছে। মেজাজও বিগড়ে গেছে। তার নেশা যখন ধরতে শুরু করেছিল, তখন বলেছিলুম, 'একটা ডিভোর্স স্যুট ফাইল করে দাও। একেবারে ফ্রি হয়ে যাও, তারপর তুমি আর আমি শুধু, জীবনের খেলাঘর হাসি আর গানে ভরে তুলব।'

ফিক্ করে হেসে বলেছিল, 'আপনার সঙ্গে? আই হ্যাভ নো ইনটেনসান!' শুনে, আমার ভেতরটা কেমন করে উঠেছিল। সে কি! আমার কোন আকর্ষণ নেই!

'তুমি আমাকে পছন্দ করো না?'

'এই বয়সে?'

বয়েস তুলে কথা বললে ভীষণ খারাপ লাগে। আমার কি এমন বয়েস হয়েছে। দু'একটা চুল পেকেছে। সে তো আমি

কলপে ঢেকে রেখেছি। তুমিই বা কি এমন কাঁচ খুকি? বয়েস তো পেকেছে। ঘাড়ের চামড়ার বাঁধন আলগা হয়ে এসেছে। চোখের তলার চকচকে ভাব নষ্ট হয়ে গেছে। তুমি কি ভাব, তোমার আর সে বাজার আছে? নেই। কোনও যুবক তোমার প্রেমে পড়বে?

আমি বলেছিলুম, 'তা হলে তুমি আমাকে নাচাচ্ছ কেন?'

অনুমতি বলেছিল, 'আমি নাচাব কেন? আপনি তো নিজেই নাচছেন।'

'সে কি?'

'যেটি আছে সেইটিতেই সন্তুষ্ট থাকুন। নতুন করে কিছু হবে না।'

অনুমতি হাসতে লাগল। চপল হাসি। এ কি তার মনের কথা! বিশ্বাস হল না।

'আমি তাহলে আলেয়ার পেছনে ছুটছি?'

'পুরুষদের সেইটাই তো স্বভাব। বিশেষ করে বিবাহিতদের।'

আবার হাসতে লাগল। চাপা হাসি। নেশা লাগা চোখে তাকাতে তাকাতে গেলাসে কায়দার চুমুক।

'তুমি তাহলে আমার সঙ্গে এলে কেন?'

'আপনি বোকা বলে।'

অনুমতির কথা শুনে কেমন যেন হয়ে গেলুম। মনের ঢাকনা খুলে গেছে। সত্য, নির্মম সত্য বেরিয়ে আসছে।

'তুমি আগে কখনও মদ খেয়েছ?'

'খাওয়ালে খেয়েছি।'

'খাওয়াবার লোক ছিল বুঝি?'

'পৃথিবীতে বোকার তো অভাব নেই।'

আমার আর ঘাঁটাতে সাহস হল না। তারপর আবিষ্কার করলুম, দু পেগের ঘৃণা চার পেগে ভালবাসা হয়ে গেল। অনুমতি ঢলে পড়ল আমার গায়ে। আমার গালে হাত বোলাতে লাগল। আপনি নেমে এল তুমিতে। বললে, 'ষাঁড়ের চেয়ে পাঁঠা ভাল। ঘোড়ার চেয়ে গাধা।'

হেয়ালির মত শোনাল। আমি আর ব্যাখ্যা চাইলুম না।

শেষে আমার কোলের ওপর প্রায় শুয়ে পড়ল, 'ওই ডাইনীটাকে খুন করতে পার না।'

মধুমতীকে ডাইনী বলায় আমার ভীষণ কষ্ট হল। যতই হোক আমার বউ তো। খিটখিট করে, শাসন করে। ঝগড়া করে। সব ঠিক। কিন্তু ডাইনী নয়। আমারও তখন বেশ নেশা হয়েছে। কথা এলে যাচ্ছে। আমি বললুম, 'কোন শালা ডাইনী বলে?'

আমি দেখেছি মদের মাত্রা বেশী হলেই, প্রথম যে গালাগাল মুখে আসবে তা হল শালা। আসবেই আসবে।

অনুমতি অনুরূপ জড়ানো গলায় বললে, 'শালা নয় শালী। আমি বলছি।'

আমি চিৎকার করে বললুম, 'প্রভু ইজ দ্যাট শি এ ডাইনী!'

'ও তাকালে দুধ ছানা কেটে যায়। শরীরের রক্ত জল হয়ে যায়। ডাইনীদের ছেলেপুলে হয় না।'

'তাহলে তুমিও ডাইনী।'

'আমার হলেই হতে পারে। হতে দিইনি আমি।'

'আমি পুরুষ হলে মধুমতীর বিশটা ছেলে হত।'

'তবে তুমি কি!'

আমি উত্তর দিতে পারলুম না। কেঁদে ফেললুম। আমার বংশ নির্বংশ হয়ে যাবার শোকে, আমি ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলুম। অনুমতি নেশার ঘোরে বললে, 'অ্যায়, কাঁদিসনি। ঠাকুরকে ডাক, ঠাকুরকে ডাক।'

বাইরে এসে দেখি বহুত রাত। আকাশ কালো হয়ে ঝুলে এসেছে। পাগলা বাতাস বইছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে পশ্চিম আকাশে। কি হবে! সব মানুষই এই সময়ে বাড়িতে ফিরতে চায়। চালা বাড়ি, ভাঙা বাড়ি, পাকা বাড়ি, যেমন বাড়িই হোক, মানুষ ফিরতে চায়।

আমার পা টলে যাচ্ছে। দিক ভুল হয়ে যাচ্ছে। আমি সব জানি, খেতে জানি, শুতে জানি, পাকা পাকা কথা বলতে জানি, শয়তানি জানি, মাতাল এক মহিলাকে কি ভাবে সামলাতে হয় জানি না?

অনুমতি গান গাইতে শুরু করেছে। ফুটপাথে গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে নাচার চেষ্টা করছে। তালি বাজাচ্ছে। ও এতটা বেসামাল হয়ে যাবে আমি ভাবিনি। আমার ভয় করছে। আমি যে মধ্যবিত্ত মধ্যবয়সী ভদ্রলোক। আমি ছিঁচকে চোর। ঘরে বসে লুকিয়ে লুকিয়ে পাপ করব। ডুবে ডুবে জল খাব, শিবের বাবাও টের পাবে না। বাইরে আমি সম্মানিত জেণ্টলম্যান থাকতে চাই।

আমি অনুমতিকে ধমক লাগালুম। সে আমায় পাল্টা ধমক দিল। আমি প্রায় জনশূন্য রাজপথের দিকে তাকিয়ে জড়ানো গলায় চিৎকার করলুম, 'ট্যাক্সি ট্যাক্সি।'

ঠুনঠুন করে একটা রিকশা এগিয়ে এল। লোকটার চেহারা দেখে মনে হল, বিপদে ফেলতে পারে। সে খুব মিহি গলায় বললে, 'আইয়ে।'

কলকাতার মাতাল রিকশা ভালবাসে। রিকশা ভালবাসে কলকাতার মাতাল। জানি, তবু ভয় হল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে শুরু হল প্রবল বৃষ্টি। ঝোড়ো বাতাসে সব ওলটপালট। নীল বিদ্যুৎ। অনুমতি ভিজে সপসপে। শাড়ির আঁচল ফুটপাথে লুটোচ্ছে। গায়ের সঙ্গে লেপটে গেছে ভিজে কাপড়। লাল ব্লাউজ ভিজে রক্তরাঙা। নীল বিদ্যুতের আলোয় তার বৃষ্টি ধোয়া শরীর যেন বড়লোকের বাগানে পাথরের ভেনাস।

রিকশাঅলা বললে, 'জলদি আইয়ে।'

লোকটির ঘাম দুর্গন্ধ শরীরে ভর রেখে আমরা কোনও ক্রমে উঠে বসলুম। ময়লা গন্ধঅলা পর্দা নেমে এল। রিকশা নেচে নেচে চলতে লাগল। আমাদের ভিজে শরীর দুলতে লাগল, টলতে লাগল। চালের ওপর বৃষ্টি পড়ছে। সেই শব্দে ঘুম আসছে। অনুমতি নেতিয়ে পড়েছে।

এক সময়ে মনে হল কোথায় চলেছি। লোকটা ঠুন ঠুন করে কোথায় নিয়ে চলেছে। প্রবল বর্ষণ এখন ঝিরিঝিরি। মাঝে মাঝে আকাশ-ফাঁড়া বিদ্যুৎ। গুরু গুরু মেঘের গর্জন। একেবারে হিন্দি সিনেমা।

পর্দা সরিয়ে লোকটাকে জড়ানো গলায় জিজ্ঞেস করলুম, 'কোথায় যাচ্ছিস ?'

লোকটা বললে, 'যাঁহাসে আয়া।'

'কাঁহাসে ?'

লোকটা একটা পাড়ার নাম বললে।

আমি হাসতে লাগলুম। 'বুদ্ধু কাঁহাকা।'

আমরা ভদ্রলোক। রেসপেকটেব্‌ল জেণ্টলম্যান। আমাদের বাড়ি আছে। বৈঠকখানা আছে। মহাপুরুষের ছবি দোলে দেওয়ালে। বুককেসে রবীন্দ্ররচনাবলী, গীতা, ভাগবত, বেদ-বেদান্ত থাকে। গাধা কাঁহাকা।

লোকটা বলল, 'মস্ত্‌ হো গিয়া।'

আমি বললুম, 'তুমহারা কেয়া!'

বৃষ্টি থেমে গেছে। মেঘের আড়াল থেকে একটা চাঁদ বেরিয়েছে। গাছের ভিজে পাতায় দুধের মতো সাদা চাঁদের আলো। আমার গান গাইতে ইচ্ছে করছে, আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে।

আমাদের বাড়ি এসে গেল। দরজার সামনে ডুরে শাড়ি পরে মধুমতী দাঁড়িয়ে আছে। পাশের রকে শুয়ে আছে একটা কুকুর অনুমতি আমার গলা জড়িয়ে ধরে টলতে টলতে নেমে এল।

ছেলেবেলা থেকে শিখেছি, দোষ করলে ক্ষমা চাইতে হয়। মধুমতীর খর দৃষ্টির সামনে আমরা দুজনে দাঁড়িয়ে আছি। ভিজে জাব। অনুমতিকে দেখাচ্ছে সে যুগের নায়িকা মধুবালার মতো। গাইতে ইচ্ছে করছে, বরসাতমে হামসে মিলে তুম সাজন বরসাত কি রাতমে হামসে মিলি তুমসে মিলি।

আমরা দুই অপরাধী শিশুর মতো মধুমতীর সামনে জড়োসড়ো। রাত অনেক। পাড়া নিস্তব্ধ। ঝিমঝিম চাঁদের আলো। রিকশা চলে যাচ্ছে ঠুনঠুন করে।

আমি একগাল হেসে বললুম, 'কুপুত্র যদি বা হয়, কুমাতা কখনও নয়। মা, মাগো করে ফেলেছি মা। তোমার অপরাধী সন্তানকে ক্ষমা করে দে মা।'

অনুমতি বললে, 'তোমার মা, আমার তাহলে শাশুড়ি।'

মধুমতী সঙ্গে সঙ্গে পা থেকে চটি খুলে বোনের গালে পটাপট মারতে লাগল।

'করো কি, করো কি! এখুনি সারা পাড়া জেগে উঠবে। আমরা রেসপেক্টেবল জেন্টলম্যান। ঘরের কেচ্ছা লিকআউট করবে।'

অনুমতি বলছে, 'তুই আমার গায়ে হাত তুললি। তোর স্বামীটা তো আমার কুকুর। আ-তুতু করলে ল্যাজ নাড়ে।'

আমার ভীষণ রাগ হল। বললুম, 'মুখ সামলে।'

মধুমতী চটি ফেলে ভেতরে চলে গেল। সামনের বাড়ির বারান্দায় দু'জোড়া ঘুম ভাঙা চোখ। অনুমতি দাঁড়িয়ে আছে দরজার সামনে। শাড়ি খুলে পড়েছে। লাল ব্লাউজ ঢাকা বুক উঠছে নামছে।

আমি কাঁধে হাত রেখে বললুম, 'ভেতরে চলো।'

সে বললে, 'জানোয়ার।'

দুই

একটা কিছু ঘটে যাবার পর সকালটা কেমন লাগে। ক্যাট ক্যাট করছে রোদ। খা খা করছে কাক। বিছানায় চিৎ। চোখ দুটো খোলা। মনটা ফাঁকা, মনে হচ্ছে কাল রাতে এই বাড়িতে কেউ মারা গেছে। কে সে? সে হল আমি। রাত হল স্বপ্ন। দিন হল বাস্তব। সেই দিনের মুখোমুখি হতেই হবে। হতেই হবে আমাকে।

বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালুম। মাথাটা ভার হয়ে আছে। বাড়িটা অসম্ভব নিস্তব্ধ। ঘড়ি দেখলুম। বাবা, নটা বেজে গেছে। এক ফালি রোদ জানালা গলে মেঝেতে এসে পড়েছে।

ঘরের বাইরে এলুন। কেউ কোথাও নেই। রান্নাঘর নিস্তব্ধ। বাথরুমে জল পড়ার শব্দ নেই। মধুমতী কোথায়? কোথায় অনুমতি? অনুমতি বিছানায় বেহুঁশ। সেই লাল ব্লাউজ।

শরীর যেন ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে। বড় লোভনীয় ভঙ্গিতে শুয়ে আছে। থাক। অনুমতি আমার রক্তমুখী নীলা।

সারা বাড়ির কোথাও মধুমতী নেই। নিজের ঘরে ফিরে এলুম। বুকটা ঢিপঢিপ করছে। বিছানার ধারে বসলুম। সামনে খোলা জানলা। ঝকঝকে দিন। চকচকে গাছপালা। মানুষের বাড়িঘর। ছাদে ছাদে রঙিন শাড়ি বাতাসে ফুলছে। এক ঝাঁক পায়রা উড়ছে। একটা ঘুড়ি লাট খাচ্ছে বাতাসে। মধুমতী। চোখে জল এসে গেল।

সেই প্রথম বুঝলাম মধুমতীকে আমি কত ভালবাসি। অনুমতি অ্যাডভেঞ্চার, মধুমতী আমার নির্ভর। কোথায় গেল। এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি। টেবিলে এক টুকরো কাগজ তার ওপর চাবির রিং। শুধু রিং নয়, আরও কয়েকটা জিনিস। এক জোড়া দুল। একটা সরু গলার চেন। দুটো আংটি। এক জোড়া চুড়ি। এক জোড়া শাঁখা। কিছু দূরে হাঁ করে দাঁড়িয়ে জিনিস কটা লক্ষ্য করতে লাগলুম। যেন সদ্য খুন করা একটা মৃতদেহ দেখছি।

আস্তে আস্তে কাগজটা তুলে নিলুম। মধুমতীর লেখা দুটো মাত্র লাইন—সব রইল। তোমরা সুখী হও। আমাকে খোঁজার চেষ্টা করো না। পাবে না। আমার চোখ ঝাপসা হয়ে এল। মনে হল আমার ভেতর থেকে ভেতরটা বেরিয়ে গেল। ছেলেবেলায়, আমাদের ফুটবল খেলার মাঠটা সন্ধ্যায় যখন নির্জন হয়ে যেত, তখন এক পাল শেয়াল এসে হুয়া হুয়া করে ডাকত। প্রথম শীতের উত্তুরে বাতাস বইত, আর সেই ডাক শুনে আমার মনটা যেমন করে উঠত, এখন ঠিক সেই রকম করছে। এত রোদ, এমন ঝলমলে সকাল, আমার মনে হচ্ছে শীতের ধোঁয়া ধোঁয়া সন্ধ্যা, একপাশে শেয়াল তার স্বরে কাঁদছে।

আমি চিঠিটা হাতে নিয়ে ছুটে গেলুম অনুমতির ঘরে। তখনও অচেতন তরল নেশার ঘুমে। হাত দুটো মাথার দু'পাশে তোলা। চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। পা দুটো দুপাশে ছড়ানো। শাড়িটা বিছানার এক ধারে পড়ে আছে তালগোল পাকানো। খাটের ধারে থমকে গেলুম। কে মধুমতী! মুহূর্তের জন্য সব

ভুল হয়ে গেল। আর আমাকে পায় কে! ছেলেবেলায় যেমন আনন্দে বুক দুলে উঠত, অঙ্কের স্যার মারা গেছেন, আজ ইস্কুল ছুটি।

আমার ম্যাডাম মারা গেছে, আজ ইস্কুল ছুটি। সারাদিন ঘুড়ি ওড়াব সারাদিন গুলি খেলব। আজ আর কেউ শাসন করবে না। অনুমতির জন্যে আমার মধুমতী গেছে। সেই ঘুমন্ত অনুমতি আমাকে ডাকছে। আয় রে আয়, লগন বয়ে যায়। মেঘ গুড়গুড় করে।

অনুমতির গালের একটা জায়গা লাল হয়ে আছে। জুতো মারার দাগ। জানলার পর্দা টেনে টেনে ঘরটাকে অন্ধকার মতো করে দিলুম। পাখাটাকে চালিয়ে দিলুম ফুল স্পিডে। যে ভাবে মানুষ মন্দির প্রদক্ষিণ করে, আমি সেইভাবে খাটটাকে প্রদক্ষিণ করলুম বার তিনেক। কি করব বুঝতে পারছি না। আমি যেন একটা বেড়াল। মিটসেফের চারপাশে ছোঁক ছোঁক করছি।

হঠাৎ অনুমতি চোখ মেলে তাকাল। প্রথমে বুঝতে পারল না ঘরে কে? মারাত্মক ভঙ্গিতে আড়ামোড়া ভাঙল। তারপরে ধড়মড় করে উঠে বসে বলল, 'এ কি, কার হুকুমে আপনি এ ঘরে ঢুকেছেন? অসভ্য! জানোয়ার!'

মনে হল, আমার নোলায় কে যেন গরম খুন্তির ছেঁকা দিল। আমি চুপসে গেলুম। সেই হিসেবটা মনে পড়ল, দু পেগে ঘৃণা, চার পেগে ভালবাসা। আমি কোনও রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললুম, 'সর্বনাশ হয়ে গেছে। এই নাও, এইটা পড়।'

অনুমতি সেইরকম খোলামেলা অবস্থায় নিজেকে ঢাকার চেষ্টা না করে চিরকুটটা পড়ল। তারপর অলস অবহেলায় মেঝেতে ফেলে দিয়ে বলল, 'ভয় দেখাচ্ছে।'

অনুমতি নিশ্চিন্ত আরামে আবার শুয়ে পড়ে বললে, 'চা করতে জানেন?'

'জানি।'

'তাহলে আগে, এক কাপ লেবু চা করে আনুন।'

মধুমতীর সংসারে অভাব ছিল না। সবই আছে। চা করে নিয়ে গেলুম। অনুমতি কাপে চুমুক মেরে বললে, 'কি করবেন এখন?'

'জানি না। মাথায় আসছে না।'

'আত্মহত্যা করার মেয়ে নয়।'

'কোথায় যেতে পারে! তোমার কি মনে হয়?'

'কে জানে কোথায় গেছে! আপনার বউ আপনি ভাবুন।'

'তোমারও তো দিদি।'

'কাল আমাকে জুতো মেরেছে।'

'আমরা অন্যায় করেছি।'

'বেশ করেছি। আপনি এখন যান। আমি ঘুমবো।'

'কিছু পরামর্শ দাও।'

'পরামর্শ? আমার মাথায় আসছে না। আমি এখন ঘুমবো। রান্না হলে ডাকবেন।'

'সে কি? তুমি থাকতে আমি রাঁধব!'

'বাবা, রান্নাটান্না আমার আসে না। কোনও কালে করিনি।' ঘর ছেড়ে বেরতে যাচ্ছি, অনুমতি আদুরে গলায় ডাকলে, 'এই।'

ফিরে তাকালুম। চোখাচোখি হল।

'আপনার আনন্দ হচ্ছে না?'

'না।'

'আমার হচ্ছে।'

গ্যাস, স্টোভ, উনুন। মধুমতীর সংসারে ত্রিবিধ আয়োজন। বেশ গুছিয়েই সংসার করত। যার সংসার সে-ই নেই। এটা আবার একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল। মেয়েছেলের এতটা রাগ ভাল নয়। সেকাল হলে কি করত! এক একটা লোক তিনটে-চারটে বিয়ে করত। বিয়ে না করলেও, ঘরে একটা বাইরে একটা, এ তো আকছার হতই। সেইটাই ছিল রেওয়াজ।

অনুমতির ডাক শোনা গেল, 'অ্যায়!'

এ আবার কি ধরনের অসভ্যতা! আমার নাম কি 'অ্যায়'? মধুমতী নেই বলে অনুমতিরও বাড়াবাড়ি শুরু হয়েছে। এখন বুঝছি, এ মেয়ে কেন সংসার করতে পারল না। সময়ের চেয়ে একটু বেশি এগিয়ে আছে। আজ থেকে বিশ বছর পরে সব মেয়েই হয় তো এই রকম হয়ে যাবে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে

বললুম, 'কি বলছ! অমন বিশ্রী ভাবে শুয়ে না থেকে উঠে পড় না। অনেক বেলা হয়েছে।'

আড়ামোড়া ভেঙে বললে, 'আমি কি তোমার বউ না কি?'

'হতেও তো পার।'

'ফুঃ।'

আবার একটা ধাক্কা খেলুম। বলে কি! আমারই ঘরে আমারই খাটে শুয়ে আমাকেই উড়িয়ে দিচ্ছে। এ জিনিসকে হটাতে না পারলে আমাকেও মধুমতীর রাস্তা ধরতে হবে।

অনুমতি বললে, 'আমি চান করব।'

চান তো আর খাটে শুয়ে শুয়ে করা যাবে না, উঠে একটু কষ্ট করে বাথরুমে যাও।'

'এক বালতি গরম জল করে দাও।'

'এই গরমকালে গরম জল?'

'আমি গরম জলেই চান করি। দিদি করে দিত। তুমিও করে দাও।'

আমি সরে এলাম। মনে মনে ভাবলাম, এ কি লেগে থাকা নেশার ঘোরে বলছে, না আমার নেশা চটকে দেবার জন্যে বলছে? এর একমাত্র দাওয়াই মধুমতীর স্লিপার।

সরে আসতে না আসতেই আবার ডাক পড়ল, 'অ্যায়।'

'আবার কি হল?'

'অমন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছ কেন?'

'কি করতে হবে?'

'আমার খিদে পেয়েছে।'

'উঠে তৈরি করে নাও। রান্নাঘরে সব মজুত আছে।'

'তুমি বাজার যাবে না?'

'না।'

'আমার এই শাড়িটা যে কাচতে দিয়ে আসতে হবে।'

ইচ্ছে করে করছে, না এইটাই স্বভাব! তাড়াতাড়ি জামাকাপড় পরতে লাগলাম।

পালাতে হবে। মনে আছে, বহুকাল আগে আমি বেদেদের কাছ থেকে একটা কুকুর বাচ্চা কিনে এনেছিলুম। বলেছিল ভাল

জাতের বিলিতি কুকুর। একটু বড় হতেই দেখা গেল বিলিতি নয়, জাত নেড়ি। কুকুরটার খেঁউখেঁউ চিৎকারে প্রাণ যায়। শেষে ছেড়ে দিয়ে আসতে হল। জাত না বুঝে ঘর করতে গেলে এই অবস্থাই হয়। আবার ডাকছে, 'অ্যায়।'

ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বললুম, 'কি অ্যায় অ্যায় করছ! আমার একটা নাম আছে। পদবী আছে। আমাদের দু'জনেরই একটা সম্পর্ক আছে।'

অনুমতি হেসে উঠল। বললে, 'রাগ করছ?'

চুপ করে রইলুম।

'তোমার ব্যাঙ্কে কত টাকা আছে?'

'কেন? সে খবরে তোমার কি প্রয়োজন?'

'তুমি যে বলেছিলে।'

'কি বলেছিলুম!'

'আমাকে রানী করে দেবে।'

আমি সরে আসছিলুম, অনুমতি বললে, 'শুনুন?'

থমকে গেলুম, এ একেবারে অন্য গলা।

'ঘরে আসুন।'

'বলো।'

'কেমন লাগছে?'

'কি কেমন লাগছে?'

'আমার এই অসভ্যতা। এই অসভ্য দেহ। অসভ্য চালচলন!' কথা বলতে বলতে শাড়িটা জড়িয়ে নিল শরীরে।

'খুব খারাপ লাগছে।'

'তবে!'

'তবে কি? কি তবে?'

'আপনি কেন তবে আমাকে খারাপ করতে চাইছিলেন! আমি বাজারের মেয়েমানুষ?'

চুপ করে রইলুম।

'কেন আমাকে দিয়ে আপনার ঘর ভাঙালেন? দিদি ভালমন্দ একটা যদি কিছু করে বসে থাকে, কে দায়ী হবে?'

'তুমি।'

'আমি ? আমার কোনোও ভূমিকা নেই। দায়ী হবেন আপনি। আপনার এই আধবুড়ো যৌবন। বিকৃতিতে ভরা আপনার মন। আপনার নতুনের নেশা।'

'তুমি তো বলতে, দিদি একটা ডাইনী।'

'আপনাকে পরীক্ষা করার জন্যে। দিদি ছিল দেবী। দুর্ভাগ্য, আপনার মতো একজন দানবের হাতে পড়েছিল। দিদি কি রকম ছিল জানেন, ছেলেবেলায় আমার একবার মায়ের দয়া হয়েছিল। ভয়ে কেউ কাছে ঘেঁষত না। দিদি সারা দিন আমার পাশে বসে নিমপাতা দিয়ে সুড়সুড়ি দিত।'

অনুমতির কথায় আমার স্মৃতি খুলে গেল। মধুমতী আমাকেও কি কম সেবা করে গেছে ? সেই যে যেবার আমার হারপিস হল। যন্ত্রণায় মরমর। মধুমতী সারা রাত জেগে, টিপ টিপ, ফুট ফুট, ফোঁটা ফোঁটা কি একটা জ্বালা কমাবার মলম লাগিয়ে দিত।

অনুমতি হঠাৎ কেঁদে ফেলল। কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'আমার মতো মেয়েকে জুতো মারাই উচিত। ঘর নেই, সংসার নেই, দায় নেই, দায়িত্ব নেই, টকের জ্বালায় পালিয়ে এসে তেঁতুলতলায় বাসা হল ? তোমায় চাকরি করে দোব, তোমায় চাকরি করে দোব, মেয়েদের স্বাবলম্বী হওয়া উচিত বলে লোভ দেখিয়ে নিয়ে এসে জোর করে মদ খাইয়ে মাতাল করা। ডির্ভোস করো, ডিভোর্স। শয়তান পুরুষের দল। হায়নার বাচ্চা। দেহ ছাড়া আর কিছু নেই। একটা শেষ হলেই আর একটাকে ধরো। নিত্য নতুন খাবার চাই।'

আমি মাথা নিচু করে বসে রইলুম। অনুমতি যা বলছে, সত্যিই কি আমি তাই ? কই না তো। জীবনটা এত একঘেয়ে, এত বিরক্তিতে ভরা, সব দিনই এক রকম। সব কাজই এক রকম, সব পরিচয়ই এক রকম, সব জায়গাই এক রকম, সব আনন্দই এক রকম, সব দুঃখই এক রকম, সব শত্রুতাই এক রকম, সব বন্ধুত্বই এক রকম, সব খাওয়াই এক রকম, সব রাতই এক রকম, দিনের পর দিন, দিনের পর দিন একই জীবন ধরে বেঁচে থাকা। ভাল লাগে ! মরাও যায় না, বেঁচে মরে থাকা।

'অনুমতি বিশ্বাস করো, আমি শয়তান নই, আমি লম্পটও নই, আমি প্রেমিক। আমি ভালোবাসতে চাই, ভালবাসা পেতে চাই। মধুমতীর সব ফুরিয়ে গিয়েছিল অনুমতি। সে বেঁচেছিল শুধু অভ্যাসে। ছেলেমানুষী কৌতূহলে আমি তোমাকে নাড়াচাড়া করেছি। দেখি না কি হয়। তোমাকে একটা চুমু খেয়ে দেখি না কি হয়? তোমাকে একবার জড়িয়ে ধরে দেখি না কি হয়। দু'জনে মাতাল হয়ে দেখি না কি হয়। বিশ্বাস করো অনুমতি, বেঁচে আছি বোঝার জন্যেই এই সব ঝুঁকি নেওয়া। সত্যিই যদি লম্পট হতুম তাহলে তো আরও সোজা পথ খোলা ছিল।'

অনুমতি উঠে পড়ল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমরা পথে নেমে পড়লুম। আমি আর অনুমতি। অনেকটা গল্পের মতো। যেমন আমার আংটিতে একটা পাথর বসানো ছিল, অসাবধানে খুলে পড়ে গেল একদিন। জানতুম পড়ে যাবে। ভাবতুম স্যাকরার দোকানে গিয়ে আঁকড়িগুলি একদিন ঠিক করিয়ে আনব। করা হয়নি। আলস্য, উদাসীনতা। সেই পাথর খুঁজে খুঁজে হয়রান।

আমি মনে মনে পথকে জিজ্ঞেস করলুম, পথ বলো আমার মধুমতী কোন দিকে গেছে? পথ নিরুত্তর। আমি গঙ্গাকে জিজ্ঞেস করলুম, মধুমতী কি তোমার কোলে? গঙ্গার অনন্ত কলকল ধ্বনির ভাষা আমি বুঝি না। ঘুরে ঘুরে আমরা ক্লান্ত বিভ্রান্ত। এত বড় একটা পৃথিবীতে হারিয়ে যেতে কতক্ষণ সময় লাগে? পরিচিত আত্মীয়, অল্প পরিচিত বান্ধব, কোথাও মধুমতী নেই।

থানায় ডায়েরি, কাগজে বিজ্ঞাপন, দূরদর্শন আর আকাশবাণীর ঘোষণা, সব, সব ব্যর্থ হয়ে গেল। মধুমতীর ছেড়ে যাওয়া সংসারে আমি আর অনুমতি দুই অনধিকারীর মতো দিন কাটাই। অনুমতি হাল ধরেছে, কিন্তু সে তো আমার কেউ নয়। আমরা দু'জনেই এখন ধোয়া তুলসীপাতার মতোই পবিত্র। অসীম সুযোগ খারাপ হয়ে যাবার। আমরা মদ খেয়ে মাতাল হতে পারি। অফুরন্ত সম্ভোগে দিন-রাত পার করে দিতে পারি। আমাদের আগের আমি মরে গেছে। প্রতিবেশীরা যা-তা কুৎসা রটায়। রাস্তায় বেরলে টিপ্পনি কাটে। প্রথন প্রথম অস্বস্তি হত।

লজ্জায় ছোট হয়ে যেতুম। এখন আর হই না। পবিত্র জীবনের শক্তি আমাদের সহনশীল করেছে। রাতে আমি ভাল করে ঘুমোতে পারি না। চেহারা যেন পোড়া কাঠ। চোখ ঢুকে গেছে। গাল ভেঙে গেছে। মেদ ঝরে গেছে। অনুমতির সেই সাংঘাতিক স্বামী দুবাই চলে গেছে। অনুমতির জীবনে একটা স্থিতি এসেছে। আমি তাকে একটা স্কুলে চাকরি পাইয়ে দিয়েছি।

হঠাৎ একদিন আমার বাড়িতে পুলিশী তল্লাশ হয়ে গেল। মধুমতীর কোনও এক শুভাকাঙ্ক্ষী থানায় উড়ো চিঠি দিয়েছে, আমি নাকি মধুমতীকে খুন করে অনুমতিকে নিয়ে আছি। এই বাড়িরই কোথাও মধুমতীর দেহাবশেষ লুকানো আছে।

আমি পুলিশের তল্লাসিতে বাধা দিলুম না। আমি তো চাই যে পারে মধুমতীকে খুঁজে বের করুক। মধুমতীর কঙ্কালটাই বের করুক না। তাতে আমার ফাঁসি হয় তো হোক। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমি এই জীবনেই করে যেতে চাই।

পুলিশ আমার বাড়ির সেপটিক ট্যাঙ্ক ভেঙে ফেললে। দেয়াল ভাঙলে। একতলার ঘরের সব মেঝে খুঁড়ে ফেলল। জলের ওভারহেড ট্যাঙ্ক চুরমার করে দিলে। যাবার সময় বলে গেল, 'ইউ আর আণ্ডার অবজারভেসান, পালাবার চেষ্টা করবেন না।'

আমি ফ্যাকাশে হেসে বললুম, 'কোথায় আর পালাব! আমার আর সে শক্তি নেই।'

দেখার জন্যে যারা ভিড় করে এসেছিল, তারা বললে, 'নকশা দিচ্ছে।'

এসব মন্তব্য আমার গা-সহা। মনে আর দাগ কাটে না। পুলিশবাহিনী চলে যাবার পর, অনুমতি আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললে।

আমি এতকাল তাকে স্পর্শ করি নি। ভোগের দৃষ্টিতে একবারও তাকাই নি। আমি তাকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছি, তাই সে আমাকে ভালবাসতে শিখেছে।

অনুমতি ধরা ধরা গলায় বললে, 'উঃ, আপনার কি কষ্ট! আমি আর সহ্য করতে পারছি না। বাড়িটাকে শুধু শুধু চুরমার করে দিয়ে গেল।'

আমি বলল্ম, 'এই তো আমার উপয্ক্ত পাওনা। যতভাবে পারে আমাকে শাস্তি দিক আমার ভাগ্য। শ্ধ্ ভাবছি, আমার জন্যে তোমার কি কষ্ট! অন্মতি তুমি, এইবার একটা বিয়ে করে স্খী হও।'

'আর আমার বয়েস নেই। আমি আপনাকে ভালবাসি।'

'আমার মতো পাপীকে!'

'পাপই সময় সময় প্ণ্য হয়ে যায়। আপনার চেহারাটা কি হয়েছে একবার দেখেছেন। অতীত ভুলে যান। আস্ন, বর্তমানে দ্জনে আবার বেঁচে উঠি।'

অন্মতির ছোট্ট কপাল থেকে ঝরা চুল সরাতে সরাতে আমি ভাবল্ম, প্রেম সেই এল, বড় দেরিতে এল। অন্মতির চুলে একটা দ্টো পাক ধরেছে। ম্খে শেষ যৌবনের প্রশান্তি। আমরা ফুরিয়ে আসছি। মহাকাল আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে।

বহ্দিন আমাকে এইভাবে না চাইতেই কেউ আদর করেনি। মনে হল অনেকদিন পরে ব্ষ্টি এল। আমি কাঁচের ঘরে বসে দেখছি, অজস্র ধারায় ঝরছে। চারপাশ নীল হয়ে আসছে। গাছের সব্জপাতা ন্য়ে ন্য়ে প্রথম বর্ষণকে প্রণাম জানাচ্ছে। অন্মতির শরীর আগের চেয়ে একটু ভারী হয়েছে। কোমল হয়েছে। আগে ছিল আবেগশ্ন্য, এখন স্নেহ এসেছে, দ্ঃখ এসেছে, দ্র্বলতা এসেছে, কাঁদতে শিখেছে।

অন্মতি বললে, 'আর এখানে থাকার কোনও মানে হয় না।'

'সে তো আমিও ব্ঝি, তব্ বাসা ভাঙিনি একটা কারণে, পাখি যদি ফিরে আসে!'

'আর আসবে বলে মনে হয় না। হয় পাখি নতুন বাসা বেঁধেছে, নয় পাখি মরেছে। চল্ন, আমরা অন্য কোথাও গিয়ে নতুন করে স্বপ্ন ব্নি। আর এখানে থাকা যায় না।'

'তোমার জন্যে ভাল একটা ছেলে দেখি।'

'দরকার নেই। বেশ আছি আমি। চল্ন, আমরা বিয়ে করি।'

'তুমি কোথাও একটা দ্ কামরার ঘর দেখ। যেখানে কোলাহল কম, সব্জ আছে। আকাশ আছে। একটু দ্রে হলেও ক্ষতি নেই। এমন একটা জায়গা যেখানে কেউ আমাদের চিনবে না।'

অনুমতি যেন উৎসাহ পেল। মানুষ প্রতি মুহূর্তে বাঁচতে চায়। পুরনো ফেলে দিয়ে নতুন ইতিহাস। অনুমতির বয়েস যেন হঠাৎ দু দশ বছর কমে গেল। মধুমতীর স্মৃতি আগের মতো আর পীড়া দেয় না। মন অনেকটা প্লাস্টিকের চাদরের মতো। কোন রঙই তেমন আঁকড়ে ধরে না।

একমাসের মধ্যে অনুমতি নতুন একটা বাড়ি পেয়ে গেল। বাড়িটার পাশ দিয়ে মেন লাইন চলে গেছে। একতলা। ছাদে উঠলে দূরে দেখা যায় ধানজমি। অজস্র নারকেল গাছ চারপাশে। কাছেই একটা আশ্রম। পরিবেশটা ভারি সুন্দর। চমৎকার একটা রাস্তা পাক খেতে খেতে চলে গেছে স্টেশনের দিকে, বাস রাস্তার দিকে।

বাড়িটা অনুমতির ভীষণ পছন্দ হয়েছে। এক মহিলার বাড়ি। স্বামী অল্প বয়েসেই মারা গেছেন ক্যানসারে। ব্যবসা ছিল। সব নষ্ট হয়ে গেছে। মহিলার একটি মেয়ে কলেজে পড়ে। মেয়েটির সঙ্গে অনুমতির খুব ভাব। যত দিন যাচ্ছে, অনুমতির গুণ বাড়ছে। সব চেয়ে বড় গুণ, যে কোনও মানুষকে চট করে আপন করে নেওয়া।

একদিন থানায় গিয়ে বললুম, আমি বাড়ি পাল্টাচ্ছি। এই আমার নতুন ঠিকানা। ভেবেছিলুম, বাগড়া দেবে। ভোগাবে। সে রকম কিছু হল না। অফিসার বললেন, 'আমরা কেস ক্লোজ করে দিয়েছি।'

আমি বললুম, 'আপনারা এত এফিসিয়েণ্ট, কিন্তু একটা মানুষের কোনও হদিশ করতে পারলেন না।'

হাসলেন। বললেন, 'পপুলেশান আর ক্রাইম যে হারে বাড়ছে সেই তুলনায় আমাদের এসটাব্লিশমেণ্ট যথেষ্ট নয়। মেরে লাশ লোপাট করে দিলে ধরা শক্ত।'

'মেরে বলছেন কেন? এখনও আপনারা আমাকে সন্দেহ করছেন!'

'আহা! এসব কেসে হাজব্যাণ্ড আর লাভারই তো ফার্স্ট সাসপেক্ট। যতদূর জানি, আপনার স্ত্রীর পূর্ব প্রণয়ী ছিল না। আর আপনি শালীর সঙ্গে ইনভলভড। দ্যাট মেকস টু অ্যাণ্ড টু

ফোর। এখন মুশকিল হল প্রমাণ আর সাক্ষী ছাড়া কেস দাঁড়ায় না।'

'এ আপনি কি বলছেন! আমাকে দেখলে মনে হয় খুনী?'

অফিসার সিগারেটে একটা মোক্ষম টান মেরে বললেন, 'কোনও খুনীকেই কি খুনী বলে মনে হয়! মনে হয় না। সহজ সরল স্বাভাবিক। আর খুন কি মশাই শুধু ছুরি ভোজালিতেই হয়! বুদ্ধিমান, শিক্ষিত লোক আত্মহত্যা করতে বাধ্য করে। প্ররোচনা দেয়। জজসাহেব বলবেন, ট্যান্টামাউন্ট টু মার্ডার। দিনের পর দিন, দিনের পর দিন দগ্ধাতে দগ্ধাতে শেষে একদিন জয় মা বলে ঝুলে পড়ল কি ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমার বোনটাকে গোসাবায় ওই ভাবে মেরে ফেললে। আত্মহত্যা, কিন্তু খুন। আমি পুলিশ হয়েও কিস্যু করতে পারলুম না। আইন এমন জিনিস! বড় বড় মার্চেন্ট হাউসে কি করে জানেন তো! ধরুন, কাউকে তাড়াতে চায়, তাকে নোটিস দিয়ে ছাঁটাই করে না। নিজেরা ছাঁটাই করলে আইনের অনেক ঝামেলা! অপমান করে, মেন্টালি টর্চার করে, এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করে যে, লোকটি শেষে বাপ বাপ বলে রেজিগনেশান দিয়ে পালাতে বাধ্য হয়। আপনি এই যে আপনার স্ত্রীকে একভাবে খুনই করলেন, ভেরি ক্লেভারলি, এই খুনকে বলা চলে মার্চেন্ট অফিসের একজিকিউটিভের রেজিগনেশান।'

'আমার স্ত্রী তো আত্মহত্যা করেনি। একটা চিঠি লিখে শুভ কামনা করে চলে গেছে। কোথাও একটা গেছে।'

'ন্যাকা ন্যাকা কথা বলবেন না তো। যান, বাড়ি যান। আমরা মশাই পুলিশ! আমাদের ওসব বোঝাতে আসবেন না। স্ত্রীর সামনে কচি শালীকে চটকালে স্ত্রী ওই চিঠিই লিখবে, আর তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

থানা থেকে বেরিয়ে ভাঙা পার্কের বেঞ্চে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলুম। থানার ওই গুন্ডামতো অফিসার খুব বেঠিক কিছু বলেন নি। মধুমতীকে তো আমি খুনই করেছি। ছুরি, ভোজালি, বোমা পিস্তল দিয়ে নয়। খুন করেছি অনেক উঁচু থেকে ঠেলে ফেলে দিয়ে। মধুমতীকে আমি ফেলে দিয়েছি। তার প্রতিষ্ঠার আসন থেকে তুলে ফেলে দিয়েছি। যাকে সে সবচেয়ে

বেশি আপন ভাবত, যে জমিতে দাঁড়িয়ে সে স্বপ্ন তৈরি করত, সেই জমিটাই আমি পায়ের তলা থেকে টেনে সরিয়ে নিয়েছি।

সন্ধ্যে হয়ে আসছে। চারপাশে লোকজন, গাড়ি-ঘোড়া, ব্যস্ত-সমস্ত লোকালয়, তবু মনে হচ্ছে, আমি এক নির্জন প্রান্তরে দাঁড়িয়ে আছি, আর একপাল শেয়াল ঘাড় উঁচু করে হুয়া হুয়া করে ডাকছে। আমাদের চারপাশে অনেকে, তারা হল সংখ্যা, মানুষ বাঁচে কিন্তু একজন কি দুজনকে নিয়ে। চার দেয়াল, এক ছাত, একটা পাখির খাঁচা, একটা আয়না, একজন নারী, পোষা বেড়াল, ছোট্ট পাপোশ, তোলা উনুন, কাঠের তাক, ছোট্ট কুলুঙ্গি, দেবদেবীর ছবি। ছোট সুখ, ছোট দুঃখ, ছোট ছোট অধিকারবোধ। আমার জামা, আমার গামছা, আমার লাল শাড়ি, আমার দুল, আমার ছেলে, আমার মেয়ে। এর বাইরে বিশাল জগৎ খবরের কাগজের খবর মাত্র।

আজকাল সময় পেলেই মাঝে-মধ্যে নির্জনে সরে যাই। চুপচাপ বসে থাকি কিছুক্ষণ। চাকরির একস্‌টেনসানের মত জীবনের একস্‌টেনসান। যা হবার তা হয়ে গেছে, নতুন আর কিছু হবে না। চুল যা পেকেছে তা আর কাঁচা হবে না। দাঁতে যা গর্ত হয়েছে তা আর ভরাট হবে না। হার্ট ড্যামেজ হয়েছে, লাংস চুপসে এসেছে, লিভার দরকচা মেরেছে। স্নায়ু শক্ত হয়েছে। দেহ এমন এক ঘর, যা আর মেরামত করে নতুন করা যায় না।

বসে বসে ভাবি, আমি চলে যাচ্ছি। কোথাও একটা যাচ্ছি। চাঁদ যেমন ভেসে যায় পুব থেকে পশ্চিমে। সব মানুষই যাচ্ছে। কেউ বোঝে, কেউ বোঝে না। বসে বসে ভাবি, মধুমতী যদি কোথাও বেঁচে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই বুড়ি হয়ে গেছে। চল্লিশ পেরলেই তো মেয়েরা ছেলেদের চেয়েও বয়সের ভারে এগিয়ে যায়। মধুমতীর শরীর তো তেমন ভাল ছিল না। ম্যানিয়াও ছিল। মেয়েদের ছেলেপুলে না থাকলে যা হয় আর কি!

পার্ক ছেড়ে সিনেমা হলের পাশ দিয়ে বাজারের পথ ধরলুম। সবই এত পুরনো হয়ে গেছে! সিনেমার সেই একই হোর্ডিং। নায়ক পা ফাঁক করে খাড়া। হাতে রিভলভার। পায়ের ফাঁকে নায়িকা নেচে উঠেছে। মাথার ওপর কোণের দিকে ভিলেন দাঁত

কিশকিশ করছে। পাশেই ঠাণ্ডা জল, পান, সিগারেটের দোকান। সার সার বোতলে পয়সা ঘষে জলতরঙ্গের শব্দ তুলছে। ঝালমুড়ি, চানাচুর। ব্ল্যাকার মেয়ে ব্লাউজের বুকে টিকিট গুঁজে ক্রমান্বয়ে মন্ত্র পড়ে চলেছে, দোকা পাঁচ, দোকা পাঁচ। দু চারটে পেণ্ট করা মেয়ে এপাশে ওপাশে শিকারের সন্ধানে দাঁড়িয়ে আছে। আড়ে আড়ে চাইছে। নাইলনের গেঞ্জি পরা চোয়াড়ে মার্কা গোটাকতক ছেলে তালে তালে ঘুরছে। গায়ে ঘাম আর শস্তা সিগারেটের গন্ধ। বোরখা পরা মেয়েরা গুটি গুটি সিঁড়ি ভেঙে ভেতরে চলেছে। আজও যে দৃশ্য, গতকালও সেই দৃশ্য, আগামীকালও সেই দৃশ্য।

আমি প্রথমে সেই জুতোর দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। বড় দোকান। কাঁচের ওপাশে কত জুতো। সব জুতোর জন্যেই পা অপেক্ষা করে আছে। পায়ের সঙ্গে সঙ্গে জুতো চলবে। চলতে চলতে পায়ের আগেই জুতো ছিঁড়ে যাবে। দোকানের ভেতরে একটি সুন্দরী মেয়ে লাল একটা চটি পায়ে দিয়ে, ঘুরে ঘুরে দেখছে। লাল ব্লাউজ। ঠোঁটে টুকটুকে লাল রঙ। কপালে লাল কুমকুমের টিপ। তার রূপে দোকানের ভেতরে যেন আগুন ধরে গেছে।

জুতো থেকে সরে এলুম জামাকাপড়ে। সেখান থেকে সেণ্ট, সাবান, স্নো, পাউডারে। সেখান থেকে গেঞ্জি, জাঙ্গিয়া, ব্রেসিয়ার। বিভিন্ন মাপের বক্ষবন্ধনীর উদ্ধত প্রদর্শনী। যত দিন যৌবন, ততদিন পৃথিবী।

ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে একটা চায়ের দোকানে এসে বসলুম। বসে আপন মনেই হাসতে লাগলুম। একেই বলে উদ্দেশ্যহীন জীবন। কিছুই আর করার নেই। চায়ে চুমুক দিতে দিতে জীবনের ফেলে আসা পঞ্চাশটা বছরের দিকে তাকালুম। শৈশব। খাবো আর খেলব আর ঘুমোবো। যৌবন। ভোগ করব। এ দেহ, সে দেহ। নৌকো। ঘাট থেকে আঘাটে ভেসে ভেসে। হাল ভাঙা প্রৌঢ়। পালে বাতাস নেই। এক জায়গায় গোল হয়ে ঘুরছে, দোল খাচ্ছে। এই হাল ভাঙা নৌকোর আরোহী হতে চাইছে আর এক দিশেহারা, অনুমতি। তার হয়তো আর পাঁচটা বছর আছে। এর মধ্যে মা হলে হবে, নয়তো মুখাগ্নি করার আর কেউ

থাকবে না। অনুমতিকে মা করার ক্ষমতা আমার নেই। সত্য-মিথ্যা জানি না, ডাক্তাররা সেইরকমই বলেছেন। আমার চারপাশে এত লোক। কেউ জানে না, আমার কি হয়েছে।

চায়ের দাম মিটিয়ে উঠে পড়লুম। পাশেই একটা ছবি তোলার ঝলমলে দোকান। সামনেই ফ্রেমে আঁটা এ সুন্দরী। ঘোমটাটি সবে টানতে যাচ্ছে সেই মুহূর্তের ছবি।

আজ থেকে দশ বছর আগে আমি যা ছিলুম, যে রকম ছিলুম, সেরকম ছবি কি ফটোগ্রাফার তুলতে পারবেন? সে ছিল। সে আর নেই। আমাকে ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। আয়নার সামনে দাঁড়ালে, স্মৃতি হয়ে আসে। এখন যা আছে, তাও থাকবে না। ছবির দোকানে ঢুকলুম।

ভদ্রলোক বললেন, 'কি পাসপোর্ট'?'

'না, ফুল সাইজ।'

'পা থেকে মাথা?'

'পা থেকে মাথা।'

'কালার, না ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট?'

'কালার।'

'সাদা জামা পরে এলেন। যাক ঠিক আছে, আমি একটা জামা দিচ্ছি। ভেতরে চলুন।'

কথা শেষ হতে না হতেই এক জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা এসে গেল দমকা বাতাসের মতো। তাদের ভীষণ তাড়া। নাইট শোয়ের টিকিট কাটা। ফটোগ্রাফার ভদ্রলোক আমার অনুমতি চাইলেন, এদের আগে ছেড়ে দোব!'

মেয়েটি বেশ ফাজিল। একটা চোখ আধবোজা করে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'প্লিজ দাদু।'

আমি মনে মনে বললুম, 'ঠিক আছে, নাতনী।'

ওরা ভেতরে চলে গেল। কলকলে পাহাড়ী নদীর মতো। আমি চেয়ারে বসলুম। আমার সামনে একটা আয়না। সেখানে আমার মুখ। যেন ভূত দেখছি। রঙ পুড়ে গেছে। আধপাকা চুল। চোকা চোকা ঘোলাটে চোখ। কপালে এক সার ভাঁজ। এই ছবি! এই ছবি আমি ধরে রাখতে চাই! ভয়ে ভয়ে উঠে

পড়লুম। চোরের মত পালিয়ে এসে মিশে গেলুম রাস্তার ভিড়ে। ক্যামেরাম্যান ধরে না ফেলে!

অনুমতি বললে, 'এত দেরি হল?'

'এই একটু ঘুরে-ঘারে এলুম।'

সারা বাড়িতে লুচি ভাজা ঘিয়ের গন্ধ ভুরভুর করছে। অনুমতি আজকাল আমার খাওয়া-দাওয়ার দিকে নজর দিয়েছে। দশ বছর আগের আমার সেই চেহারা ফিরিয়ে আনবেই। 'অতীত নিয়ে চটকা-চটকি করবেন না। যা হয়ে গেছে গেছে। যা হবে তা হওয়াতে হবে।'

আমরা নতুন জায়গায় আমাদের নতুন বাড়িতে উঠে গেলুম। একদিন প্রথামত আমার আর অনুমতির বিয়ে হয়ে গেল। তাতে আমাদের সম্পর্কের একটাই পরিবর্তন হল। অনুমতি নিঃসঙ্কোচে, আপনি থেকে তুমির ঘনিষ্ঠতায় নেমে এল। আর আমাদের বিছানাটা এক হয়ে গেল। আর আমার মনে হতে লাগল, অনুমতির পাশে মানানসই হবার জন্যে, চেহারাটা একটু ভাল করা দরকার। পাশে দাঁড়ালে স্বামী-স্ত্রীর বদলে মনে হয় বাপ-মেয়ে। বয়েসটা হঠাৎ এত বাড়িয়ে ফেলেছি। একটাই সুবিধে, এখানে আমাদের কেউ চেনে না।

অনুমতি এখনও ফুরিয়ে যায় নি। আমি মধুমতীকে ভুলতে পারি নি, অনুমতি কিন্তু তার প্রথম স্বামীকে ভুলে গেছে। এখানে এসে অনুমতি আবার পুরোদমে বেঁচে উঠেছে। জানলায়, দরজায় পর্দা ঝোলাচ্ছে। এটা ওটা কিনছে। নতুন খাট এসেছে। কিছু কিছু ফার্নিচার।

একদিন শুয়ে শুয়ে বললুম, 'মানুষ বড় ভুল জীবনে একবারই করে, তুমি দুবার করলে। কোনও ভাবেই আমি তোমার স্বামী হবার উপযুক্ত নই।'

আগে অনুমতিকে আমিই জড়িয়ে ধরার জন্যে ছোঁক ছোঁক করতুম, এখন অনুমতিই আমাকে জড়িয়ে ধরে। সে সরে এসে আমাকে পাশবালিশ করে ফেলল। তার ভারি পা আমার পেটের ওপর। একটা হাত আমার বুকে। গালের কাছে তার গরম নিঃশ্বাস। গায়ে চন্দনের গন্ধ।

অনুমতি বললে, 'আমার জন্যেই তোমার সংসার ভেঙেছে, আমিই আবার গড়ে তুলব। আমার একটা নৈতিক দায়িত্ব আছে।'

'তোমাকে আমি কি ভাবে সুখী করব! আমার দেহ গেছে। যৌবনে এত পাপ করেছি।'

'ও সব বিলিত কথা আমাকে বোলো না। আমারও বয়েস কিছু কম হল না। আমি আর ছুঁড়ি নেই।'

দেহবাদী মানুষ দেহের উর্ধ্বে উঠতে পারে না। শরীরে শরীর লাগিয়ে অনুমতি শুয়ে আছে। আমার ভেতরটা ছটফট করছে। মনে হচ্ছে শের হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি। শৃগালের মতো কেবল কা হুয়া, কা হুয়া, করছি। ইন্দ্রিয়ের ধর্মই হল ব্যবহার না করলে ঘুমিয়ে পড়ে। শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতো। অনুমতিও বদলে গেছে। আগের আগুন আর নেই। সে ঔদ্ধত্য নেই। কথায় সেই কামড় নেই। আমাকে পাশবালিশ করে শুয়ে থাকতে থাকতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে অকাতরে। আমি আধো অন্ধকারে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। পানের মতো মুখ। টিকলো নাক। ছোট্ট কপাল। চওড়া বুক পিঠ। শরীরটা সত্যিই সুন্দর। অবাক হয়ে ভাবি, দেহের ক্ষুধা না গেলে মনের নাগাল পাওয়া যায় না।

একা হলেই আজকাল একটা চিন্তা আমাকে পাগল করে দেয়। সেই পুলিশ অফিসারের কথা, আপনি খুনী। বড় কায়দা করে স্ত্রীকে মেরেছেন মশাই। শালীর সঙ্গে ইনভলভড। ভাবতে ভাবতে কথাটা আমার বিশ্বাসে চলে এসেছে। সেপটিক ট্যাঙ্কেই হয় তো মধুমতীর কঙ্কাল পাওয়া যাবে। কেউ আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকালে অস্বস্তি হয়। প্রশ্ন করি, কি দেখছেন অমন করে! আমি পাগল হয়ে যাব না তো!

অনুমতি বলে, 'তুমি বাড়াবাড়ি করে ফেলছ। যার যা পাওয়া উচিত নয়, তাকে তাই দিচ্ছ। এত দিন ধরে সাধারণ একজন মহিলার জন্যে এত কষ্ট পাওয়া উচিত নয়। কারুর জন্যেই পৃথিবী থেমে থাকে না।'

অনুমতি তরিবাদি করে রাঁধে, আমি খেতে পারি না। দুজনে সিনেমায় যাই। কি দেখি বলতে পারি না। সব ঘটনাই ঘটে

চলছে আমার মনের বাইরে। এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন সমন এল আমার নামে। এবার অন্য অভিযোগ। অনুমতির প্রথম স্বামী দুবাই থেকে ফিরে এসে আমার নামে কেস ঠুকে দিয়েছে। আমি নাকি তার স্ত্রীকে ফুসলে এনে আটকে রেখেছি।

একদিন হাজতবাস করে জামিন নিয়ে ফিরে এলুম। সে এক সুন্দর অভিজ্ঞতা। ও তরফ কেসটা বেশ জোরদার সাজিয়েছে। মধুমতীকে গুম করেছি, অনুমতিকে আটকে রেখেছি। প্রাণ যাবার ভয়ে অনুমতি তার প্রথম স্বামীর কাছে ইচ্ছে থাকলেও ফিরে যাবার সাহস পাচ্ছে না। আমি নাকি অ্যান্টিসোস্যাল। অতীতে আমার আরও অনেক অপরাধের রেকর্ড আছে। আমার হাতে অনেক গুন্ডা আছে।

সব শুনে অনুমতি বললে, শয়তানের খপ্পরে একবার পড়লে তার আর নিষ্কৃতি নেই। লোকটা টাকার জন্যে এই সব করে বেড়াচ্ছে। কেস উঠুক, তারপর আদালতে দেখা যাবে।'

আমার আর ভাল লাগছে না। মানুষের একটা আকর্ষণ, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ কোনও একটা কিছু থাকলে তবেই কোর্ট-কাছারি, আইন-আদালত, কামড়া-কামড়ি, লড়ালড়ি ভাল লাগে। আমার আর সেসব কিছুই নেই। আমি আজকাল আর ভাবতে পারি না। আর কোনও কিছু মনে রাখতে পারি না। অনুমতির অধিকার নিয়ে কোর্টে দৌড়ঝাঁপ আমার আর ভাল লাগছে না। অনুমতি একজন বাঘা উকিল ধরেছে। তিনি বলেছেন, ঘাবড়াবার কিছু নেই, আমি তুড়ি মেরে কেস বার করে আনব। তবে বেশ কিছু খরচ হবে।

আমি একদিন খুঁজে খুঁজে অনুমতির প্রথম স্বামীর ডেরায় গেলুম। জায়গাটা তেমন সুবিধের নয়। অবাঙালী এলাকা। ভদ্রলোক বাড়িতে নেই। একজন মহিলা বেরিয়ে এলেন। অবাঙালী। ভাঙা ভাঙা বাংলা বলেন। চোখে-মুখে রাত জাগা অত্যাচারের ছাপ। মহিলার সঙ্গে ভদ্রলোকের কি সম্পর্ক ধরা গেল না। আমার মনে হল ওই জায়গায় অনেক স্মাগলার থাকে। চারপাশে জাহাজী লোক। ক্যালোর ব্যালোর, ক্যাচোর ম্যাচোর। কোথায় খুব জোরে ইংরিজি গান বাজছে। একই সঙ্গে মাংস আর

শ‍ুঁটকি মাছ রান্নার গন্ধে তিষ্ঠনো যাচ্ছে না। আমি বেশ ভয় পেয়ে পালিয়ে এলুম।

রাতে অনুমতিকে আমার অভিযানের কথা বলতে, অনুমতি বললে, 'কেন গেলে! লোকটা এক সময় হয় তো ভাল ছিল, টাকা টাকা করে একেবারে বদ হয়ে গেছে। ওর সঙ্গ খুব খারাপ। পুলিশের খাতায় ওর নাম থাকা অসম্ভব নয়। আমি ভাবছি প্রাইভেট কোনও ডিটেকটিভ এজেন্সির সাহায্য নেব।'

'ওখানে গিয়ে একটা ভাল হয়েছে কি জানো! আমি আমার লড়াইয়ের মনোভাব ফিরে পেয়েছি। তোমাকে আমি হারাতে চাই না। আমার কাছ থেকে তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলে আমি আর বাঁচবো না।'

'আমারও সেই একই অবস্থা।'

মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু মানুষ। বাঘ, ভাল্লুক, সিংহ, বা সাপ নয়। মানুষই মানুষের সুখ কেড়ে নেয়। শান্তিতে কিছুতেই থাকতে দেয় না।

অনুমতি একটা ডিটেকটিভ এজেন্সির সঙ্গে সব ব্যবস্থা করে এল। ভালই করেছে। লোকটাকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার। খুব বেড়েছে। আমার সেই ঝিমিয়ে পড়া ভাবটা কেটে গেছে। আমার সেই বিবেকের দংশন আর নেই। মধুমতীকে কোনও দিনই আমি অবহেলা করিনি। সে যদি ভুল বুঝে চলে যায়, কি আত্মহত্যাই করে থাকে দায়ী আমি নই। দায়ী তার অসহিষ্ণুতা।

আমার পুরনো এক পরিচিতের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল সেদিন। খুব সোজা লোক নয়। সারা জীবন বাঁকা জিনিসকে সোজা করতে করতে নিজের চরিত্রটাই বেঁকে গেছে। অনেক দিন পরে দুজনে মুখোমুখি! আমাকে বললে, 'তোমাকে তো আর চেনাই যায় না। ডিসপেপসিয়ার রুগির মতো চেহারা হয়েছে।'

এক একটা লোক আছে যারা সব লোকের অভিভাবক হতে পারে। কফিহাউসে বসে তাকে সব কথা খুলে বললুম।

সে বললে, 'এর জন্যে আবার আইন-আদালত ডিটেকটিভ এজেন্সি! আমার এজেন্সির হাতে কেসটা ছেড়ে দাও, তিন দিনে সব সোজা করে দোব।'

‘তোমার এজেন্সি ?’

‘আরে আমি একটা লণ্ড্রি করেছি। আড়ং ধোলাই কেন্দ্র। গোটাকতক কেসে একেবারে সিওর ফল, যেমন, ভাড়টে উচ্ছেদ, প্রেমিক বিদায়, জমি দখল, নেতা নির্বাসন। তোমার ওই লোকটার ঠিকানা দাও, পেঁদিয়ে বৃন্দাবন দেখিয়ে দোব। এসব লোক কি রকম জানো, নিজেও খাবে না, অন্যকেও খেতে দেবে না। তোমার শালীটি কেমন ?’

চোখের একটা অশ্লীল ভঙ্গি করল। আমার ভাল লাগল না। মনে হল. একে পেট খোলসা করে সব বলে ভুল করেছি। আমার মুখের ভাব দেখে বুঝতে পারল, তার এই ধরনের ইঙ্গিতে আমি বিরক্ত হয়েছি। হাসতে হাসতে বললে, ‘ডোণ্ট মাইণ্ড।’ তুমি আমার অনেক কালের দোস্ত। জানই তো, আমি ভদ্রলোক নই, মেয়েরা চিরকালই আমার কাছে মাল, তবে নিজে কোনও দিন ঘেঁটেঘুঁটে দেখিনি, ঘেন্না করে। তুমি ওই লোকটার ঠিকানা দাও, এক ডোজ দাওয়াই ঠুকে দি। যে রোগের যে ওষুধ।’

‘ঝামেলা হবে না তো !’

‘ঝামেলা ! এই শহরে ডেলি শয়ে শয়ে লোক হাপিস হয়ে যাচ্ছে। কে কার খোঁজ রাখে দোস্ত ! পপুলেশান কমাতে হবে, এত পলিউশান ! দেখছ না সব ধসকে যাচ্ছে।’

‘দেখ ভাই, আমি যেন আবার তিন নম্বর কেসে জড়িয়ে না যাই !’

‘নো ফিয়ার। আমি কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলি।’

অনুমতিকে বললুম, ‘বুঝলে, আচমকা একটা পুরনো লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, একটু গোলমেলে লোক, তাকে সব বললুম, সে বললে লোকটাকে একটু অন্যভাবে টাইট দিয়ে ঠাণ্ডা করে দেবে।’

অমনি অনুমতির মুখের চেহারাটা কেমন যেন হয়ে গেল।

‘হ্যাঁ গো, মেরে ফেলবে না তো !’

আমি অবাক হয়ে গেলুম। ওই একটা থার্ড ক্লাস লোক, অনুমতির এখনও তার ওপর এত মমতা। প্রথম যে ! প্রথমটিকে

মানুষ ভুলতে পারে না। প্রথম পুত্র, প্রথম কন্যা, প্রথম স্বামী, প্রথম স্ত্রী, প্রথম প্রেম।

'তুমি এখনও ওকে ভালবাস?'

'মোটেই না। ও মারা গেলে, তুমি আবার জড়িয়ে পড়বে।'

'সে কথা বলেছি। জানে মারবে না। তবে একটু শিক্ষা দেবে। বুঝিয়ে দেবে, যা খুশি তা করা চলে না। বুনো ওলের দাওয়াই বাঘা তেঁতুল।'

দিন তিনেকের মধ্যেই এজেন্সির ডিটেকটিভ কিছু আশাপ্রদ খবর নিয়ে এলেন। লোকটা অপরাধ জগতের গভীরে চলে গেছে। সে সব তথ্য পুলিশের হাতে তুলে দিলে লোকটা ঘায়েল হয়ে যাবে। আর দিন সাতেকের মধ্যেই এমন একটা কেস খাড়া করে দেবেন, এজলাসে ফেলা মাত্রই দশটি বছর। আর কোনও কথা নয়।

শুনে বেশ নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। পয়সা খরচ করলে কি না হয়! আমার সেই তালেবর বন্ধু এবার কি করে দেখা যাক। সাত আট দিন হয়ে গেল কোনও খবর নেই। রোজই উদ্‌গ্রীব হয়ে কাগজ দেখি, যদি কোনও খুনখারাপির খবর থাকে। কিছুই নেই। আজকাল গণ্ডায় গণ্ডায় খুন হয়, কোনটা ছাপবে আর কোনটা ফেলবে!

কোর্টে হাজিরা দেবার দিন এগিয়ে আসছে। আমার উকিল প্রস্তুত। বলেছেন, ভয় পাবেন না। এ খুব মামুলি কেস। তিন চার দিনেই ফয়সালা হয়ে যাবে। আদালতের নাম শুনলেই ভয় করে। অনুমতির জন্যে এ দুর্ভোগ আমাকে সহ্য করতেই হবে। কোনও উপায় নেই।

প্রথম দিনেই বড় ধাক্কা খেলুম। আমার সেই সাংঘাতিক পরিচিত যে বলছিল টাইট দিয়ে ছেড়ে দেবে, সে দেখি ও তরফের প্রথম সাক্ষী। ইনিয়ে বিনিয়ে আমার অতীত, আমার বর্তমান, আমার নানা কাণ্ডকারখানা বানিয়ে বানিয়ে বেশ বলে গেল। আমি তো হতবাক। সে বললে, আমি নাকি তাকে হাজার দশেক টাকা দিতে চেয়েছিলুম মক্কেলকে মারবার জন্যে।

আমার উকিল সাক্ষীকে নানা প্রশ্ন করলেন। তেমন দাপটের উকিল নন।

ঘুঘু সাক্ষীই তাঁকে বার কতক দাবড়ে দিলে। বেশ দমে গেলুম। এইভাবে সওয়াল করলে অ্যাডালটারি চার্জে ফেঁসে যাব। আমার তরফে কোনও সাক্ষীই যোগাড় করতে পারিনি। সম্বল, আমার প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সির রিপোর্ট। কোর্টে তা গ্রাহ্য হতেও পারে নাও পারে।

অনুমতি আমাকে নানাভাবে সাহস দেবার চেষ্টা করে। দিলে কি হবে, আইন বড় সাংঘাতিক জিনিস। মধুমতীর জন্যে এক পাড়া ছেড়েছি। অনুমতির জন্যে এবার দেশত্যাগী হতে না হয়! মানসম্মান বাঁচাবার জন্যে এবার হয়তো আত্মহত্যাই করতে হবে।'

'ধরো আমি জেলেই গেলুম। দশ বছর হয়ে গেল।'

অনুমতি বললে, 'আমি অপেক্ষা করব।'

'তোমাকে তো ও টেনে নিয়ে যাবে।'

'নিয়ে গেলেই হল। গেলে তো!'

'পেয়াদা দিয়ে ধরে নিয়ে যাবে।'

'অত সোজা নয়। আমি সঙ্গে সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা ঠুকে দোব।'

আমার এমন অবস্থা, পরামর্শ নেবার মতো না আছে বন্ধু-বান্ধব, না আছে কোনও আত্মীয়। থাকার মধ্যে আছে এক নড়বড়ে উকিল। এখন হাড়ে হাড়ে বুঝছি, পৃথিবীর যাবতীয় দুর্দশার মূলে আছে মানুষের আসক্তি।

কেসটা ওপক্ষ বেশ জমিয়ে তুললে। সাক্ষীসাবুদ বেশ ভালই জুটিয়েছে। আমার আগের বাড়ির বাড়িঅলা। দুজন প্রতিবেশী। আমাদের বাড়িতে যে মেয়েটা এক সময় কাজ করত তাকেও হাজির করেছে। সবাই মিলে প্রমাণ করার চেষ্টা করছে, মধুমতীকে আমি মেরেছি। অনুমতিকে আমি বশীকরণ করেছি। হয় মন্ত্রবলে, না হয় ড্রাগস ধরিয়ে।

আদালত কি অদ্ভুত জায়গা! সকলেই কেমন যেন গল্প লিখতে পারে! আমার নামটাই কেবল আমার পিতামাতার দেওয়া, বাকি মানুষটা নতুন চেহারা, নতুন চরিত্রে ওরাই তৈরি করছে। আমি হাঁ করে দেখছি, আমার নবজন্ম! সময় সময় বেশ মজা লাগছে।

বিরোধী উকিল ঃ আসামীকে চেন?

সাক্ষী ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ।

উকিল ঃ কি ভাবে চেন ?

সাক্ষী ঃ আমি চার বছর কাজ করেছি।

উকিল ঃ আসামীর সঙ্গে স্ত্রীর সম্পর্ক কেমন ছিল ?

সাক্ষী ঃ খুব খারাপ। মাল খেয়ে এসে রোজ পেটাত। আমাকে দিদি কত দিন বলেছেন, দ্যাখ বুড়ি, ও একদিন আমাকে খুন করবে।

আমার ভোঁদা উকিল প্রশ্ন করতে পারত, মা আমার, তুমি তো সাতটার মধ্যে ডেঁড়েমুশে খেয়ে বাড়ি চলে যেতে, বউ পেটানোটা দেখতে কি ভাবে। তিনি সে সব না করে, থেকে থেকে বলতে লাগলেন, অবজেকসান, অবজেকসান।

আ মোলো, শুধু অবজেকসান বললে হয়! সাক্ষীকে জেরা কর। জিজ্ঞেস কর, একটা আংটি চুরির দায়ে কাজটা কি ভাবে গেল? কি করে সেই চুরি আমি ধরলুম! মধুমতীর নীলার আংটি পাড়ার চায়ের দোকানের ছেলেটার আঙুলে। কি কুক্ষণেই চা খেতে ঢুকেছিলুম সেদিন!

উকিল ঃ তোমার এই বাবুটির চরিত্র কেমন ছিল ?

সাক্ষী ঃ আমাকে প্রায়ই বলতো, তুমি রাতে কেন বাড়ি যাও। এখানে থাকলেই তো পার। তোমারও কিছু হয়, আর আমারও একটু ইয়ে হয়!

আমার উকিল সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করতে পারতেন, ধর্মাবতার সাক্ষী দুরকম কথা বলছে। সে নিজেই বলছে, রাতে সে থাকত না। আসামী তাকে থাকার জন্যে কাকুতিমিনতি করত। আর যে রাতে থাকত না, সে কি করে দেখত আসামী মাল খেয়ে বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে মারধোর করছে! আমার উকিল বসেই রইলেন। এক সময় মনে হল তিনি ঘুমোচ্ছেন।

বিরোধী উকিল প্রতিবেশীকে ঃ এই ভদ্রলোক সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা ?

প্রতিবেশী ঃ খুব খারাপ। ভদ্রলোককে একদিন আমি মারতে গিয়েছিলাম।

উকিল ঃ মারতে গিয়েছিলেন ?

প্রতিবেশী ঃ হ্যাঁ মারতে। নিজের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমার বাড়ির মেয়েদের অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করতেন।

আমি হেসে ফেললুম। ধর্মাবতার টেবিলে হাতুড়ি ঠুকে বললেন, 'কে হাসছে! দিস ইজ কোর্টরুম।'

আমি বললুম ঃ 'ধর্মাবতার, আমার উকিল ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমার উকিলে আর জগৎপালক ঈশ্বরে বিশেষ তফাৎ নেই। আমার হাসির প্রথম কারণ এই আবিষ্কার। দ্বিতীয় কারণ, কে কত ভাবে মিথ্যা বলতে পারে, তারই যেন প্রতিযোগিতা চলেছে! সাক্ষী মানেই মিথ্যাবাদী।'

'অবজেকসান, অবকেজসান।' আমার উকিলের গলা।

ধর্মাবতার বললেন, 'সাক্ষী মিথ্যা বলছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ডাহা মিথ্যা। যে অপরাধের জন্যে উকিল আমাকে মেরেছেন বলছেন সেই অপরাধের জন্যে আমিই ওঁকে মেরেছিলুম। নিজের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওই ভদ্রলোক আমার স্ত্রীকে অঙ্গ প্রদর্শন করতেন। দুর্যোধনের মতো উরু চাপড়াতেন। ওঁর নামে থানায় একাধিক ডায়েরি আছে।

'আপনার বক্তব্যের সাক্ষী আছে?'

'সাক্ষী আমার বর্তমান স্ত্রী।'

বিরোধী উকিল বললেন, 'মি লর্ড' গোড়াতেই গলদ। আসামী যাকে স্ত্রী বলছে, সে আসলে আমার মক্কেলের স্ত্রী, আসামী তাকে অবৈধ, নোংরা জীবনযাপনে বাধ্য করেছে, অর্থের বশে প্রলুব্ধ করে, এমন কী জীবনের ভয় দেখিয়ে।'

'প্রমাণ?'

'প্রমাণ আমাদের সাক্ষীরা।'

রাতে অনুমতি, আমার পাশে শুয়ে বলত, 'কি যে সব যাচ্ছেতাই, নোংরা ব্যাপার হচ্ছে। আমার খুব খারাপ লাগছে। এখন মনে হচ্ছে, রাসকেলটাকে কেউ মেরে ফেললে বেশ হত!'

'তোমাকে মনে হয় সত্যিই ভালবাসে, তা না হলে এত কাণ্ড করবে কেন?'

'ভালবাসে! তুমিও যেমন! ও এক ধান্দাবাজ শয়তান।

আমি ভাবছি, ভাল একজন উকিল দোব। আমাদের উকিলটা একেবারে বোগাস।'

'আমার মনে হয় টুকে পাস করা।'

'হতে পারে।'

মানুষের জীবনে সবটা খারাপ হতে পারে না। সঙ্গে ভালর স্পর্শ থাকে। এই ঝামেলায় একটা হল, আমার আর অনুমতির সম্পর্কটা বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে গেল। মনে হতে লাগল আমরা অনেক-দিনের স্বামী-স্ত্রী। মধুমতীর মতো মুখরা নয়। অনুমতি অনেক নরম। অনেক রোমাণ্টিক। আমি এখন বুঝতে পারছি একজন মহিলার অধিকার নিয়ে কেন এত ফাটাফাটি, কেন এত আইনের কচলাকচলি!

সকালে কাগজ ওল্টাতে ওল্টাতে ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপনের দিকে চোখ চলে গেল। দক্ষিণ কলকাতার সুখলাল হলে, পিপ্‌পল কোর্টের মধুমাতা সৎ ও সুখী জীবনযাপনের পরামর্শ দেবেন, শান্তিলাভের পথ বাতলাবেন।

মধুমাতা নামটা দেখে কেমন যেন হল! মধুমাতা আর মধুমতী প্রায় এক। অনুমতিকে কিছু বললুম না। মধুমাতা যদি সত্যিই মধুমতী হয় আর একবার যদি আদালতে এসে দাঁড়ায় আমার কেস মিনিটে ঘুরে যাবে।

সন্ধ্যে ছটার সময় সুখলাল হলের সামনে গিয়ে দেখি গাড়িতে গাড়িতে ছয়লাপ। বড়লোকরা, ব্যবসায়ীরা হই হই করে ছুটে এসেছে, সৎ আর সুখী জীবনের লোভে, শান্তির আকর্ষণে। আমাকে একবার এক বড়লোক বলেছিলেন, আর পারি না ভাই। রোজ রাতে পার্টি, আর মদ খেতে খেতে, এই দ্যাখো আমার ভুঁড়ি, এই দ্যাখো আমার দু চোখের কোল। ভুঁড়ির জন্যে বসতে পারি না, নিচু হতে পারি না। পায়ের কাছে কি আছে দেখতে পাই না। সেদিন আমার কারখানার সামনে একটা ফুটপাথের বাচ্চাকে আর একটু হলেই মাড়িয়ে পুঁটুকপাঁট করে ফেলছিলুম!'

আমি প্রশ্ন করেছিলুম, 'মানুষ কি করে এত বড়লোক হয়?'

ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, 'মেরে।'

উত্তীর্ণ যৌবনা সব ফ্যাশানেব্‌ল মহিলারা এসেছেন। বিলিতি

পারফ্যুমের একঘেয়ে গন্ধে চারপাশ ম-ম করছে। আম-কাঁঠালের গন্ধের মত এই গন্ধটাও পেটেণ্ট হয়ে গেছে। বগল কাটা জামা। খোলা এক ফুট থলথলে পেট। হোস পাইপের মত দুটো হাত। ফিনফিনে শাড়ি আর গন্ধ, মহিলা-বাজার।

মধুমাতার পরামর্শ নিতে অনেকে এসেছেন। আমি হলের একেবারে পেছনের সারিতে একপাশে জড়োসড়ো হয়ে বসলুম। বড়লোকদের জীবনেই দেখছি যত অশান্তি। সব চেয়ে বেশি অসুখী হলেন তাঁরাই। আমার মতো আর দ্বিতীয় কেউ নেই। ভয়ে ভয়ে বসে আছি। ঘাড় ধরে দূর না করে দেয়।

দুজন সন্ন্যাসিনী ভজন গাইছেন। চিদানন্দ রূপঃ শিবোহহং শিবোহহং। এঁরা মনে হয় মধুমাতার শিষ্যা। বয়স বেশি নয়। জ্যোতির্ময়ী মূর্তি। সংসার কটাহের বাইরে থাকতে পারলেই দেখছি চেহারায় একটা জ্যোতি আসে। ভাজা-ভাজা, খাজা-খাজা ভাবটা আর থাকে না। এঁদের রূপ ছিল ঃ কিন্তু পুরুষ হায়নার শিকার হবার আগেই সরে গেছেন। আমি মনে মনে প্রণাম করলুম।

সমস্ত আসন ভরে গেছে। মোটা মোটা তাগড়া তাগড়া পুরুষ আর মহিলা। শাড়ির খসখস শব্দ। কেউ কেউ কৌটো খুলে মুখে পানমশলা ফেলছেন। পরিচিত কাউকে দেখলে, আইয়ে আইয়ে করে চিৎকার করছেন। দু-চারটি ব্যবসার কথা হচ্ছে। এরই মাঝে ভজন শেষ হলে মঞ্চে এলেন এক অবাঙালী পুরুষ। নমস্তে, নমস্তে করে তিনি যা বললেন, তা হল, অনেক ভাগ্যে হলে জীব মানুষ হয়ে জন্মায়। আর একটু বেশি ভাগ্য হলে, মানুষের প্রকৃত মানুষ হবার ইচ্ছে জাগে আর মহাভাগ্য হলে মহামানব বা মহামানবীর সঙ্গ মেলে। প্লেটোনে কহা থা, টু লিভ ইজ নাথিং, টু লিভ রাইটলি ইজ এভরিথিং। চড়পড়, চড়পড় হাততালির শব্দ।

মধুমাতা ধীরে ধীরে মঞ্চে প্রবেশ করে তাঁর নির্দিষ্ট উচ্চাসনে বসলেন। গৈরিক বসন। মাথায় জটাজাল। দীপ্ত মধুর মুখ-মণ্ডল। তপ্ত কাঞ্চন গাত্রবর্ণ। মালার পর মালা, তার ওপর মালা। দেখতে দেখতে তিনি ফুলের ভারে প্রায় অদৃশ্য হয়ে

যাবার মতো হলেন। আর এক সন্ন্যাসিনী এগিয়ে এলেন তাঁকে মালামুক্ত করার জন্যে। ধূপের গন্ধ, ফুলের গন্ধে কেমন যেন আধ্যাত্মিক নেশা ধরে গেল।

মধুমাতা বরাভয়ের ভঙ্গিতে একটা হাত তুললেন। বললেন, শান্তি, শান্তি, শান্তি। তিনটি মাত্র শব্দের ঝঙ্কারে, সকলে অভিভূত, মন্ত্রমুগ্ধের মতো হয়ে গেলেন আর আমার ভেতরটা আনন্দে ছলকে উঠল। এ গলা আমার চেনা। আমার সেই মধুমতী। আমার যাঁতাকল থেকে বেরিয়ে গিয়ে কি হয়েছে! পুরো দস্তুর সন্ন্যাসিনী। এক হলঘর লোক রামভক্ত হনুমানের মতো সামনে বসে আছে। গর্বে আমার বুক দশহাত। আমার হনুমতী। মঞ্চে লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছে, কার বউ দেখতে হবে তো!

আমি আমার পাশের ভদ্রলোককে আনন্দের আতিশয্যে বলে ফেললুম, 'শি ইজ মাই ওয়াইফ।'

লোকটি তার পাশের জনকে ফিসফিস করে কি বললেন! তিনি তার পাশের জনকে। একেই বলে হুইসপারিং পাবলিসিটি। আর দেখতে হবে না, এইবার আমাকে সাদরে মঞ্চে তুলে মালা দিয়ে আমার মধুমতীর পাশে বসিয়ে দেবে। আমি প্রথমেই বলব, হ্যাঁ গা, তোমার ওই জটাটার কিছু করা যায় না! শ্যাম্পুট্যাম্পু করে। ওতে যে উকুন আছে!

হঠাৎ আমার ঘাড়টা পেছন দিক থেকে কলার মতো আঙুল দিয়ে কে চেপে ধরল! একেই বলে ক্যাঁক করে চেপে ধরা। আমাকে আমার বউয়ের সামনে ঘাড় ধরে মঞ্চে তুলুক, এ আমি চাই না।

কানের কাছে কে বলে উঠল, 'শালা!'

এ আবার কি! এ আবার কোন ধরনের অভ্যর্থনা! ঘাড় ধরে চেয়ার থেকে খেলার পুতুলের মতো তুলে হিড় হিড় করে টানছে, অসভ্য জানোয়ারটা।

'বাহার চলো।'

আমি সেই অবস্থায় চিৎকার করে উঠলুম, 'মধুমতী এই দ্যাখো আমাকে তোমার লোকেরা মারছে, মধুমতী।'

সেই বলে না, মেরে তোমার জিওগ্রাফি পালটে দেব। আমার দেহের ভূগোলও পালটে গেল। বাইরে নিয়ে গিয়ে বেদম প্রহার দিলে। যে ধোলাইটা অনুমতির স্বামীর জন্যে আমি ব্যবস্থা করেছিলুম, সেই ধোলাই খেলুম আমি। রাম চিরকালই উল্‌টো বোঝেন।

বাইরে পুলিশ ছিল। তারা আমার জিম্মা নিল। আমি অর্ধচেতন অবস্থায় বললুম, 'ভাই বিশ্বাস করো, ওই মধুমাতা আমারই স্ত্রী মধুমতী। তোমরা দয়া করে একবার তাকে খবরটা দাও। দিলেই দেখবে আমার গলায় জুতোর মালার বদলে ফুলের মালা দুলছে।'

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার যেটুকু জ্ঞান ছিল, সেটুকুও গেল। পুলিশ এমন প্রাণী, মারার জন্যে হাত একেবারে নিশপিশ করে। সামনের দুটো দাঁত খুলে পড়ে গেল।

যখন জ্ঞান হল, তখন আমি পড়ে আছি বিশ্রী একটা হাস-পাতালে, বাথরুমের পাশে মেঝেতে। আমাকে চোখ মেলতে দেখে, আমার পাশে শুয়ে থাকা একজন প্রশ্ন করলে, 'কি পকেটমার ?'

আমি কোঁতাতে কোঁতাতে প্রশ্ন করলুম, 'আপনি ?'

'ওয়াগন ব্রেকার।'

আমি আমার ওই শোচনীয় অবস্থাতেও মনে মনে না হেসে পারলুম না, একেই বলে মানুষের পোড়া কপাল। কোথা থেকে কোথায় ? বাথরুমের পাশে মেঝেতে পতন। সঙ্গী ওয়াগন ব্রেকার। সে আমাকে ভাবছে পকেটমার। মধুমতীর স্বামীর কি অবস্থা ! রাত এখন কটা ? অনুমতি কি করছে একা একা ! সে কি খবর পেয়েছে ! কে জানে ! আমি আবার চোখ বুজলুম। এখন নিদ্রাদেবীই আমাকে রক্ষা করতে পারেন। আর কেউ নয়।

ওয়াগন ব্রেকারকে জিজ্ঞেস করলুম, 'এরপর কি হবে ?'

'আগে ধরা পড়নি ?'

'না ভাই।'

'পাকা হাত ?'

'তাই তো বলে !'

'কাল চালান যাবে। কেস উঠবে। ধরে নাও তিন মাস।'
'বাঃ, সুন্দর।'
'আর যদি মুরুব্বির জোর থাকে খালাস।'
আমার অপরাধের একটা তালিকা পুলিশ করেই রেখেছিল। অনুমতি নিজের চেষ্টায় খবরাখবর নিয়ে আমাদের সেই মাকালফল উকিলটিকে নিয়ে যথাসময়ে হাজির হল আমাকে খালাস করার জন্যে। উকিল শিখিয়ে দিলেন, কোর্টে ম্যাজিস্ট্রেটের মুখে মুখে তর্ক করবেন না। সমস্ত অভিযোগের এক উত্তর, হুজুর অন্যায় হয়ে গেছে।
ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, 'মদ্যপ অবস্থায় সুখলাল হলের ধর্মসভায় ঢুকে মারামারি করেছিলে?'
'হ্যাঁ হুজুর।'
'কুড়ি টাকা। পুলিশের কাজে বাধা দিয়েছিলে?'
'হ্যাঁ হুজুর।'
'তিরিশ টাকা। এক ভদ্রমহিলার প্রতি অশালীন আচরণ করেছিলে?'
'হ্যাঁ হুজুর।'
'পঞ্চাশ টাকা।'
মোট একশো টাকার অপরাধ। ছাড়া পেয়ে গেলুম। একশোতেই শেষ নয়, আরও খরচ আছে, সামনের দাঁত দুটো বাঁধাতে হবে। শরীরের বিভিন্ন জায়গায় তাপ্পি মারতে হবে। ছোটখাট রিফুরও প্রয়োজন আছে।
কলকাতার অবশিষ্ট পার্ক যে কটা আছে, তারই একটায় বসে অনুমতি বললে, 'কি হয়েছিল?'
আমি বললুম, 'পেয়েও হারালুম।'
'সে আবার কি?'
'আরে তোমার দিদি, আমার বউ মধুমতী এখন বিরাট সন্ন্যাসিনী, মধুমাতা। কাল সুখলাল হলে হাজার লোককে উপদেশ দিচ্ছিল। শান্তিলাভের উপায়। আমি আমার পাশের লোককে যেই বললুম শি ইজ মাই ওয়াইফ, মেরে আমার জিওগ্রাফি পালটে দিলে। কাল সকালেও আমার একত্রিশটা দাঁত ছিল, এই দ্যাখো,

আজ দুটো কম। তলপেটে অ্যায়সা ঘুষি মেরেছে, কনসটিপেশান হয়ে গেছে। একপাতা জোলাপ লাগবে।'

'সত্যি দিদি ?'

'কোনও সন্দেহ নেই।'

'কি নাম বললে, মধুমাতা ?'

'মতি থেকে মাতা।'

'কি রকম দেখলে ?'

'অসাধারণ। মাথায় এই এতখান জটা। কি চেহারা, জ্বলজ্বল করছে। গেরুয়ার রঙ আর গায়ের রঙ মিশে গেছে। তবে কি জান, সেই একই রকমের স্বার্থপর। আমাকে যখন ধোলাই দিচ্ছে, চিৎকার করে বললুম, মধুমতী, তোমার ঠ্যাঙাড়েরা আমাকে ঠ্যাঙাচ্ছে। শুনতেই পেল না। বলেই চলেছে, বিষয় বিষ। বিষয়কে বাইরে রাখ, অন্তরটাকে ঈশ্বরের জন্যে খালি করো। ততক্ষণে গোটা তিনেক ঘুষি আমাকে মেরে দিয়েছে। কান ভোঁ ভোঁ করছে। তারই মাঝে শুনলুম মধুমতী বলছে, কম খাও, গম না করো। আর শুনতে পেলুম না গুম গুম ঘুসির চোটে প্রায় বেহুঁশ।'

'মধুমতীকে তো পুলিশ খুঁজে পায়নি ?'

'না। কোথায় আর পেল।'

'ডায়েরি করা আছে ?'

'আছে।'

'তাহলে এখন পুলিশের কাজ। খবর পেলেই ধরে আনবে।'

'তাতে আমার কি লাভ ? জটা আমি একদম সহ্য করতে পারি না। ওই জটঅলা গেরুয়াধারী সন্ন্যাসিনীকে নিয়ে আমি কি করব ! রোজ দেড় কেজি আপেল, এক কেজি মালাই, আধ কেজি আঙুর। ফলাহারেই আমার অনাহার। কে সামলাবে হ্যাপা ! ও জিনিস আশ্রমেই ভাল। ওর সেবা কে করবে ! মতি থেকে মাতা, বুঝলে না, পান থেকে চুন খসলেই চেলারা চেলাকাঠ দিয়ে পেটাবে।'

মধুমাতা আজ আবার সৌরাষ্ট্র হলে ভক্তদের দর্শন দেবেন। কাগজে বিজ্ঞাপন। আমার আর শরীরে তেমন বল নেই। একটা

চোখ ফুলে প্রায় বুজে এসেছে। ওপরের ঠোঁট থেঁতলে গেছে। কোমর সামনে বেঁকছে না। শোচনীয় অবস্থা।

অনুমতি বললে, 'তুমি একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ, আমি তোমার সঙ্গে না থাকলেই যত বিপত্তি। আমিই তোমার পথ। আজ তুমি আর আমি একসঙ্গে যাব।'

'পাগল হয়েছ! এক সঙ্গে গেলে রক্ষে থাকবে!'

'আহা, আমরা কি আর মধুমতীর কাছে যাচ্ছি, আমরা যাচ্ছি মধুমাতার কাছে।'

'না ভাই, আমি আর মার খেতে রাজি নই। আর কি হবে, মধুমতী তো মরেই গেছে।'

'আমরা পুলিশ নিয়ে যাব। তাদের জানা উচিত মধুমতী বেঁচে আছে। সে এখন মধুমাতা।'

'আর পুলিশটুলিশ ধরে টানাটানি কোরো না, খুব হয়েছে।'

'কি বলছ তুমি, ওদিকে একটা কেস ঝুলছে, সেই কেসের সঙ্গে আর একটা কেস যোগ হল, মদ্যপান করে ধর্মসভায় ঢুকে অশালীন আচরণ! তুমি হারতে চাও, জেলে যেতে চাও, না সংসার করতে চাও?'

'আমার এখন সব গুলিয়ে যাচ্ছে। বাঁচলেও হয়, মরলেও হয়। পুলিশের বদলে রিপোর্টার নিয়ে চলো, এ তো ভাওয়াল সন্ন্যাসীর কেস।'

'তুমি কি করে বুঝলে মধুমাতাই দিদি। ঠিক দেখেছ তো?'

'এত বছর ঘর করার পরও চিনতে পারব না, কি বলছ তুমি! আমি মনে মনে জটা ছাড়িয়ে, দেহটাকে একটু রোগা করে, কণ্ঠস্বর মিলিয়ে, পুরোপুরি চিনে তবেই পাশের হোঁতকাটাকে বলেছিলুম, শি ইজ মাই ওয়াইফ।'

অনুমতি কাগজের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

'এই দ্যাখো, তুমি কাগজটাও ভাল করে দেখ না। মধুমাতাকে কলকাতায় কারা এনেছে জান, এই দ্যাখো ঠিকানা, শুদ্ধ চেতনা, নিউ আলিপুর।'

'কি করে দেখবো বলো! এখন আমাকেই কে দেখে তার ঠিক

নেই। চোখে সরষেফুল, মুখ ফুলে ঢোল। সামনের দুটো দাঁত হাওয়া।'

দুপুরে একটা ট্যাক্সি ধরে আমরা দুজনে শুদ্ধ চেতনায় হাজির হলুম। গেরুয়া রঙের সুন্দর বাড়ি। শান্তি নির্জন। কলিং বেল টিপতেই যিনি বেরিয়ে এলেন তাঁকে দেখে বুক কেঁপে উঠল। সেই গুণ্ডাটা, যে আমাকে কাল ঘাড় ধরে রদ্দা মেরেছিল।

অনুমতি নমস্কার করে বললে, 'আমরা মাতাজীর সঙ্গে দেখা করব।'

'কোথা থেকে আসছেন?'

'কাগজ থেকে।'

মন্ত্রের মতো কাজ হল। আমার কাঁধে ক্যামেরা। কম দামী। তা হোক। ছবি ওঠে। সে ছবি চেনা যায়। টিপটপ সাজানো বৈঠকখানা। পুরু কার্পেটে পা ডুবে যাচ্ছে। ভেতর থেকে আসছে ধূপের গন্ধ, ফুলের গন্ধ। কোথাও হালকা সুরে সেতার বাজছে। ভেতরে কেউ একজন গুনগুন করে কিছু একটা পাঠ করছে। আমরা দুজনে মুখোমুখি বসে আছি বোকার মতো। বসে বসে ঐশ্বর্য দেখছি। কত পয়সা হলে মানুষ এই ভাবে ঘর সাজাতে পারে! কালো টাকার খেলা। সাদা টাকায় এই সব হয় না।

ভেতর থেকে বড় দুটো প্লেটে প্রসাদ এল। ফল-মিষ্টি, সঙ্গে সাদা পাথরের গেলাসে সরবত। আমি বিনীতভাবে বললুম, 'আমার খাবার উপায় নেই। কাল এক জায়গায় ছবি তুলতে গিয়ে মাস্তানদের হাতে মার খেয়েছি।

ভদ্রলোক বেশ অভিভূত হলেন। বললেন, 'আপনাদের প্রফেসান ভীষণ টাফ। ফুল অফ হ্যাজার্ড'স।'

আমি সরবতটুকু খেলুম। দারুণ স্বাদ। প্লেট আর গেলাস ভেতরে চলে গেল। অল্পক্ষণ পরেই ডাক এল। মাতাজী দেখা করবেন। একজন সন্ন্যাসিনী ধমকের সুরে বললেন, 'হাত ধুয়েছ! খেলে হাত ধুতে হয় জান না?'

আমরা দুটি অবোধ বালক-বালিকা। গুটি গুটি বেসিনে গিয়ে হাত ধুয়ে এলুম। ওপাশে মধুমাতার বিশ্রামকক্ষ। ঢোকার

সময় বুকটা কেমন কেমন করে উঠল। ঠিক এমনই হয়েছিল ফুলশয্যার রাতে। মধুমতী খাটে আর আমি দরজায় ছিটকিনি তুলে ধীরে ধীরে ফিরে আসছি। বুকের ভেতর রক্ত ছলাক ছলাক করছে।

জানলায় ভারি ভারি পর্দা। ঘরটা অন্ধকার অন্ধকার। আতরের গন্ধ। ঠাণ্ডাই মেশিন ঝিরঝির করে চলছে। নিচু গদির ওপর সিদ্ধাসনে মধুমাতা। জ্যোতির্ময়ী। আমরা ঢুকতেই মধুর স্বরে বললেন, 'আও বেটা। আও বেটি।

অনুমতি সঙ্গে সঙ্গে বললে, 'এ কে? সত্যিই তুমি একটা গাধা।'

মাতাজী হাসতে হাসতে বললেন, 'স্বামীকে গাধা বলছিস বেটি! এ যুগের মেয়ে তো!'

আমি ধপাস করে বসে পড়লুম। সত্যিই ধাঁধা লেগে গেছে। একবার মনে হচ্ছে মধুমতী আবার মনে হচ্ছে মধুমাতা। কি করে জানলেন, আমি অনুমতির দু নম্বর স্বামী!

'মা' বলে আমি মাতাজীর পায়ে লুটিয়ে পড়লুম। 'তুমিই জানো মা।'

ওই অবস্থায় মনের সন্দেহ কিন্তু যায়নি। যদি মধুমতী হয় তাহলে এর চেয়ে বড় পরাজয় আর কি হতে পারে! স্বামী মা বলে পায়ে লুটোচ্ছে। তা লুটোক! মহাদেবের কি হয়েছিল! স্ত্রী বুকে উঠে নেচেছিলেন।

মাতাজী আমার মাথার পেছনে হাত রেখে বললেন, 'মঙ্গল মঙ্গল, শান্তি, শান্তি।' আমি মাথা তুললুম। আবেগে কেঁদে ফেলেছি। আমার এত কষ্ট! জীবন প্রায় শূন্য। মাতাজীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললুম, 'মা, তুমি মধুমতী নও?'

'আমি মধুমাতা।'

অনুমতী বললে, 'তুমি একে চিনতে পারছ?'

'পারছি বেটি। আমার অনেক বেটার এক বেটা।'

আমি বললুম, 'মা আমাকে পথ দেখাও।'

মাতাজী হেসে বললেন, 'সংসারই তোর পথ। প্রারব্ধ ক্ষয় কর।'

গদির পাশ থেকে একটা রুদ্রাক্ষ তুলে নিয়ে আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'বেটা ধারণ কর। বিপদ কেটে যাবে।'

'আমাকে দীক্ষা দাও।'

'সময় হয়নি।'

অনুমতি আমায় চিমটি কাটছে। ইশারায় বলছে, উঠে পড়। অনুমতির দেব-দ্বিজে তেমন বিশ্বাস নেই। একটু কম্যুনিস্ট ধরনের।

মাতাজী বললেন, 'তোমরা কোন কাগজের?'

আমি বললুম, 'আমরা কোনও কাগজের নই। মিথ্যে কথা বলেছি। তা না হলে দেখা হত না। কাল তোমার জন্যে বেধড়ক ধোলাই খেয়েছি।'

মাতাজী বললেন, 'পাপক্ষয় হল।'

আমি এবার পা স্পর্শ করে প্রণাম করলুম। পা দুটো খুব চেনা। তারপর ভাবলুম, সব পা-ই তো এক রকম। অনুমতি আর প্রণাম করল না। দুজনে উঠে দরজার কাছ অবধি এসেছি, এমন সময় পরিষ্কার বাঙলায় মাতাজী বললেন, 'অনুমতি, গাধাটাকে দেখিস।'

যার যেমন

আমি একটা মানুষ? আমার কোনও ইয়ে আছে? এই ইয়ে শব্দটার কোনও তুলনা নেই। 'ইয়ে'টা যে 'কিয়ে' তা ব্যাখ্যা করা যায় না; ভেতরে অনেক না বলা বাণী ঢুকে আছে। আমার কোনও 'ইয়ে' নেই।

আমাতে আর মৃগাঙ্কতে অনেক তফাৎ। আমাতে আর অভিজিতে অনেক তফাৎ। আমাতে আর গজেন ঘোষে অনেক তফাৎ। মৃগাঙ্ক, অভিজিৎ, গজেন আলাদা আলাদা নাম হলেও একই ধরনের মানুষকে বোঝাচ্ছে। সফল মানুষ। জীবনে সফল। জীবিকায় সফল। ফুচকার মতো ভোগের জলে টইটম্বুর হয়ে ভাসছে।

রোজ সন্ধ্যেবেলা আমিও বাড়ি ফিরি। মৃগাঙ্ক কি গজেনও বাড়ি ফেরে। কত পার্থক্য। আকাশ-পাতাল ব্যবধান। মৃগাঙ্কর গাড়ি বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। সিলভার গ্রে রঙের দোতলা বাড়ি। চারপাশে বাগান। বারান্দায় আইভি-লতা। যুঁই। গেটের মাথায় লোহার অর্ধ-চন্দ্র। তার ওপর বোগেনভ্যালিয়ার আসর। যেন সানাই বাজাতে বসেছে, আলি আহমেদ খান। বাগানে নানা রঙের গোলাপ। হাসনুহানা। যত রাত বাড়ে, রোমান্টিক হতে থাকে, ততই গন্ধ বাড়তে থাকে।

মৃগাঙ্কর লিপস্টিক লাল গাড়ি বাড়ির সামনে থামা মাত্রই, চারজন ছুটে আসে, মৃগাঙ্কের মা, মৃগাঙ্কের বউ, মৃগাঙ্কের ছোকরা চাকর, মৃগাঙ্কের ধেড়ে অ্যালসেশিয়ান। ড্রাইভার দরজা খোলা মাত্রই, মৃগাঙ্কের ডান পা বেরিরে আসবে। ঝকঝকে জুতো। কুচকুকে কালো মোজা। ধবধবে সাদা চামড়া! ডান পা-কে অনুসরণ করবে বাঁ পা। মৃগাঙ্ক নামক বিশেষ্যটি স্প্রিং-এর মতো নেমে আসবে। বেলুন আকাশ থেকে মাটিতে পড়ে গেলে যে রকম হাল্কা নাচে, মৃগাঙ্ক ঠিক সেইরকম অল্প একটু নেচে নেবে। পরিধানে

রুলটানা স্যুট। বুকের ওপর চওড়া টাই। চোখে বিলিতি ফ্রেমের চশমায় অভিমানী কাঁচ। পোলারাইজড গ্লাসের বাংলা অনুবাদ। কাঁচে রোদ লাগলে অভিমানে কালো হয়ে ওঠে।

মৃগাঙ্ক যখন স্প্রিং-এর মতো নাচছে, তখন ড্রাইভার আর ছোকরা দুজনে মিলে গাড়ির পেছন হাতড়ে মালমশলা নামাতে ব্যস্ত। প্রচুর প্রচুর মশলা নামে। রোজই নামে। প্রথমে নামবে একটা বাস্কেট। বেতের তৈরি সুদৃশ্য একটি ব্যাপার। মনে হয় ত্রিপুরা থেকে স্পেশাল আমদানি। সাধারণ মানুষের হাতে অমন বস্তু সহসা দেখা যায় না। লণ্ডন থেকেও আসতে পারে। কারণ মৃগাঙ্কের সবই ফরেন। দিশী মালে অসম্ভব ঘৃণা। পারলে দিশী দেহটাকেও বিলিতি করে ফেলত। উপায় নেই। সে করতে হলে মরতে হবে। মরে টেমসের ধারে পিটার বা রবিনসনের ঘরে জন্মাতে হবে। আবার নব ধারাপাত প্রথমভাগ দিয়ে জীবন শুরু করতে হবে। বাস্কেটে কী থাকে আমি জানি। থাকে লাঞ্চ বক্স। এক বোতল বিশুদ্ধ জল। গরম করে. ঢাল ওপর করে হাওয়া খাইয়ে ক্লোরিন দিয়ে বোতলে ভরা। এ দেশে জল নিয়ে না কি ইয়ারকি চলে না। জল এ-দেশে জীবন নয়, মরণ। পাট করা একটা নরম তোয়ালে থাকে। থাকে সিজন্যাল ফ্রুটস. দু-একটা ওষুধ। কথায় বলে, প্রিভেনসান ইজ বেটার দ্যান কিওর। দামী শরীর। কত কিছুর আক্রমণ থেকে সামলে রাখতে হয়। একজিকিউটিভ ব্যামো কী একটা! হার্টে জমাট রক্ত ধাক্কা মারতে পারে। লিভারে কি লাংসে ক্যানসার ঢুকতে পারে। মৃগাঙ্ক আগে যখন এতটা দামী ছিল না, তখন একের পর এক খুব সিগারেট খেত। এখন ভীষণ টেনসানের সময় একটা কি দুটো। তাও দামী বিলিতি।

বাস্কেটের পর নামবে ব্রিফ কেস। নামবে একটা সুদৃশ্য ফ্লাস্ক। সারা দিনের মতো কয়েক গ্যালন দুধ ছাড়া, চিনি ছাড়া কালো কফি থাকে। আর নামে পার্ক স্ট্রিটের নামী দোকানের কেক আর প্যাস্ট্রির বাক্স। এ এক এলাহি ব্যাপার। রোজ সকালে লোডিং রোজ বিকেলে আনলোডিং। শরীরের রক্ত-সঞ্চালনকে একটা লেভেলে এনে মৃগাঙ্ক প্রথমেই যা করবে তা হল ওই বাঘের মতো কুকুরটার সঙ্গে একটু আদিখ্যেতা। কুকুরের সায়েবি নাম রেখেছে,

রাখুক, আমার কিছু বলার নেই। অ্যালসেশিয়ান। তার নাম ভোলা, কি গজা রাখলে মানাত না। মৃগাঙ্ক কুকুরের মাথা চাপড়াবে আর বলবে, 'ডিক্, আমার ডিক্, তোমার সব ঠিক?' ডিক্ আধ হাত জিভ বের করে হ্যাঃ হ্যাঃ করবে।

মৃগাঙ্ক আদুরে গলায় বলবে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ বন্দো গয়ম, গয়ম।' তারপর আকাশের দিকে মুখ তুলে বলবে, 'ওঃ, হোয়াট এ সালট্রি ওয়েদার! অফুল!' কুকুর ছেড়ে মৃগাঙ্ক সামনে এগোতে থাকবে আর তার বুকের কাছে টাইয়ের নট খুলতে খুলতে পেছুতে থাকবে মৃগাঙ্কর মেয়ে। মৃগাঙ্কর সময় খুব কম। বাড়িতে ঢুকে টাইয়ের ফাঁস খোলার সময়টুকুও সে দিতে চায় না। বাপির যে সময়ের খুব অভাব মৃগাঙ্কর মেয়ে তা জানে! মেয়ে কেন বাড়ির সবাই তা জানে। মৃগাঙ্ক কথায় কথায় বলে 'সিসটেম', 'প্ল্যানিং,' 'ইউটি-লাইজেসান'।

বাড়িতে ঢোকা মাত্রই মৃগাঙ্কের বউ একটা হ্যাঙ্গার হাতে পাশে এসে দাঁড়াবে। মৃগাঙ্ক হাত দুটো পেছন দিকে ছেতরে দেবে, সঙ্গে সঙ্গে তার ছোকরা চাকর কোটটা সুরুৎ করে খুলে নিয়ে মেম-সায়েবের হাতে দিয়ে দেবে। মৃগাঙ্ক চেয়ারে বসবে। নিমেষে খুলে ফেলবে জুতো-মোজা।

মৃগাঙ্কের মেয়ে বিলিতি স্টিরিও সিসটেম সেতার চড়াবে। মৃগাঙ্ক বলে, মিউজিকের একটা সুদিং এফেকট্ আছে। সেতার শুনতে শুনতে জামা আর ট্রাউজার খোলা হয়ে যাবে। হাতে এসে যাবে নরম তোয়ালে। মৃগাঙ্ক ধীর পায়ে এগিয়ে যাবে বাথরুমের দিকে। ফাইভস্টার বাথরুম। এই সময় লোডশেডিং হতে পারে। হলেও ক্ষতি নেই। নিজস্ব জেনারেটার আছে। ফ্যাট্ ফ্যাট্ চলবে। ফটাফট আলো জ্বলে উঠবে। বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে মৃগাঙ্কের মুখ আয়নায় হেসে উঠবে। ছোট্ট করে মুখ ভ্যাংচাবে নিজেকে। মৃগাঙ্ক পড়েছে মনটাকে শিশুর মতো করে রাখতে পারলে শরীর ফিট থাকে। যৌবন আটকে থাকে। স্মৃতি ভোঁতা হয় না। মৃগাঙ্ক কোমর দুলিয়ে খানিক নেচে নেয়। নিজের সঙ্গে আবোল তাবোল কথা বলে। শিশুর মতো বলতে থাকে, বিশ্বকর্মা পুজোয় মাঞ্জা দিয়ে ঘুড়ি ওড়াবো। ঘুড়ি

কিনব, একতে, আন্দে। কাল সকালে পড়া হয়ে গেলে গুলি খেলব। খোকন আমার সঙ্গে পারবে?

খোকন ছিল মৃগাঙ্কের বাল্য-বন্ধু। এখন কোথায় আছে, কে জানে।

মৃগাঙ্ক বলবে, বড়দি, দুটো টাকা দিলে, দুটাকারই লেবু লজেন্স কিনবো। যত সব ছেলেবেলার পরিকল্পনার কথা বলতে থাকে একে একে। বলতে বলতে একেবারে শিশুর মতো হয়ে যাবে। ঘুরে ঘুরে বারকতক নাচবে। তারপর বাথটাবের কলদুটো খুলে দেবে। তখন সে গণিতজ্ঞ। গরম জলেরটায় দু'প্যাঁচ মেরে, ঠাণ্ডা জলেরটায় মারবে ছ'প্যাঁচ, তবেই সে 'টেপিড ওয়ার্ম' জল পাবে। বাথটাব ভরে গেলেই জলে এক খাবলা নুন ফেলে দেবে। এই নুন তাকে গেঁটে বাত থেকে বাঁচাবে।

নুনটা গলতে গলতে মৃগাঙ্ক জোরে জোরে দম নিতে নিতে 'চেস্ট একস্‌পানসান' করবে। তারপর দেহটাকে সমর্পণ করবে বাথটাবের জলে। ডান হাতের নাগালের মধ্যে দেওয়ালদানিতে বিলিতি সাবানের দুধ সাদা কেক। মৃগাঙ্ক জল নিয়ে ভুঁড়িতে থ্যাপাক থ্যাপাক করবে। ছোট ছেলের মতো নানা রকম শব্দ করতে থাকবে মুখে। তখন সে আর শিশু নয়। একেবারে সদ্যোজাত। ওঁয়া ওঁয়া করলেই হয়।

এই সময়টাকে মৃগাঙ্ক বলে, 'মোমেণ্টস অফ ব্লিস অ্যাণ্ড হ্যাপিনেস।'

এইবার আমার কথায় আসি। আমি আর মৃগাঙ্ক সমবয়সী। কপাল গুণে মৃগাঙ্ক গোপাল, আর আমি কপাল দোষে গরু। আমাব গাড়ি নেই। আমার বাহন মিনি। আমি মিনিতে ধারের আসনে আধ ঝোলা হয়ে বসব দেখতে দেখতে ক্ষুদে যানের কুঁচকি-কণ্ঠা টেসে যাবে যাত্রীতে। আমাকে ভুঁড়ি দিয়ে, হাঁটু দিয়ে চেপে ধরবে। ব্রহ্মতালুতে কনুই মারবে। মেয়েরা মাথার ওপর ভ্যানিটি ব্যাগ রাখবে। মাঝে মাঝে আঁচলে মুখ ঢেকে যাবে। একবার এক ভদ্রলোক আমার মাথায় নস্যির ডিবে রেখে নস্যি নিয়েছিলেন।

আমি ওই রকম আড় কাত হয়ে ঘণ্টা খানেক থাকবো। জ্যাম

থাকলে দেড়, দু'ঘণ্টা। তারপর ধুপুস করে স্টপেজে নামব। কণ্ডাকটার মাথায় চাঁটি মেরে টিকিট দেখতে চাইবে। আমার আকৃতিটাই এই রকম যে যেই দেখে সেই ভাবে, ব্যাটা একটা ছিঁচকে চোর। মেরে পালানো পার্টি। চেহারায় কোনও আভিজাত্য নেই। বড় দোকান থেকে জিনিস কিনে বেরোবার সময় দরজার ধারে টুলে বসে থাকা দারোয়ান বিশ্রী গলায় বলবেই বলবে, 'ক্যাশ মেমো'। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা আমি কোনও দিন ভুলবো না। একদিন গ্র্যাণ্ড হোটেলের তলা দিয়ে লিণ্ডসের দিকে হেঁটে চলেছি। আমার সামনে হাঁটছেন, লম্বা চওড়া 'স্যুটেড বুটেড' এক ভদ্রলোক। তাঁর ঠোঁটে বাঁকা করে ধরা একটি পাইপ। পাইপ থেকে ফিকে ধোঁয়া উঠছে। তিনি চলেছেন, আমি চলেছি। তিনি চলেছেন গ্যাট ম্যাট করে, আমি চলেছি খুড়ুস খুড়ুস, যেন ঘোড়ার পেছনে গাধা।

লিণ্ডসেতে পড়ে তিনি বাঁয়ে বেঁকলেন, আমিও। তারপর আবিষ্কার করলুম, দু'জনেরই গন্তব্যস্থল এক। একই দোকানে। দোকানের কাঁচের দরজার সামনে দাঁড়াতেই দ্বাররক্ষক টুল থেকে তড়াক করে উঠল, সেলাম বাজাল, দরজা টেনে ধরল, পাইপ ঢুকে গেলেন, আর আমি যেই ঢুকতে গেলুম, দরজাটা সে ছেড়ে দিলে, ধাঁই করে আমার নাকের ওপরে। আমার শরীরের একমাত্র শোভা আমার নাক—পিচবোর্ড কাট। আমার লম্বাটে মুখের ওপর খাড়া হয়ে আছে। যেন ওটা আমার নাক নয়। প্রক্ষিপ্ত। মহাভারতের গীতা যেমন প্রক্ষিপ্ত। ও নাক এ মুখের নয়। অন্য কোনও মুখের। অনেকটা নাকু মামার মতো। আমার স্ত্রী যখন আমাকে ন্যাকা বলে, তখন মনে হয় এই নাক দেখেই বলে। আমারও কিছু কিছু শুভার্থী বন্ধু আছেন, সবাই আমার শত্রু নয়। সেই রকম এক বন্ধু বলেছিলেন, 'তোমার গাল দুটো দেবে যাওয়ায় নাকের স্ট্রাকচারটা অত ঠেলে উঠেছে। গাল দুটো সামহাউ একটু ভরাট করার চেষ্টা করো, তাহলে তোমার ওই মুখ যা দাঁড়াবে না? জেম অফ এ পিস। ফরাসী প্রেসিডেণ্ট দ্য গলের মতো হয়ে যাবে।

তারপরই আবিষ্কার করলুম, গাল ভরাট করা পৃথিবীর

সবচেয়ে কঠিনতম কাজ। অনেকটা বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার মতো। পুকুর ভরাট করা যায়, চোয়াড়ে গাল ভরাট করা যায় না। ধার করে, দেনা করে ফ্যাট খাও, প্রোটিন খাও, ভুঁড়িটাই বেড়ে গেল, খাবলা গাল, খাবলা গালই থেকে গেল।

দোকানের দরজাটা ধাঁই করে নাকে লাগতেই সর্দি হয়ে গেল। আমি তো আর মুষ্টি-যোদ্ধা নই। নাকে ঘুষি হজম করার শক্তি কোথায়? দ্বারপালকের ওপর রাগ হল। তার বয়েই গেল। আমার মতো ফেকলুকে সে পাত্তা দেবে? ঠাণ্ডা, সুন্দর দোকানের ভেতর সেই সমাদৃত পাইপ ঘুরে ঘুরে শাড়ি দেখছেন, কার্পেট দেখছেন, বিছানার চাদর দেখছেন। কী আগ্রহ নিয়ে দোকান-বালিকারা তাঁকে দেখাচ্ছেন। তিনি মাঝে মাঝে পাইপ-চ্যুত হয়ে অল্প-স্বল্প মন্তব্য করছেন। আমাকে কেউ পাত্তাই দিচ্ছে না। বলছি, চাদর, বলছে, ওই তো চাদর দেখুন না। বলছি শাড়ি, বলছে এখানে শাড়ির অনেক দাম।

পাইপ সারা দোকান ওলটপালট করে দিয়ে, শুধু হাতে প্রস্থান করলেন। মাঝে মাঝেই তাঁকে বলতে শুনলুম, ন্যাট মাই চয়েস, দ্যাটস নট ফাইন, বেটার সামথিং। ভেবেছিলুম বড় খদ্দের যাবার পর ছোট্টার দিকে নজর পড়বে। কোথায় কী! সুন্দরীরা নিজেদের মধ্যে গল্প শুরু করলেন। আমি তাঁদের সামনে কাউণ্টারের উল্টো দিকে গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলুম। মোটা সুন্দরী, ছিপছিপে সুন্দরী, রোগা সুন্দরী, ভুরুওলা সুন্দরী, ভুরু আঁকা সুন্দরী, খোঁপা সুন্দরী, এলো সুন্দরী। কত কী যে তাঁদের বলার আছে! মাধুরীদি স্বপ্নাকে কি বলেছে? সান্যালদাটা ভীষণ অসভ্য। ওরই মধ্যে একজন বলে ফেললে, পোঁদে লাগে, একদিন ঝাড় খাবে। আমার রুচিশীল কান বললে, পালাও। পালাব মানে! সোজা ম্যানেজার। তিনি ছুটে এলেন, 'তোমরা ভদ্রলোককে শাড়ি দেখাচ্ছ না কেন?' স্লিম সুন্দরী আমার দিকে তাকিয়ে চোখ মটকে বললে, 'আহা, বোবা না কি? না বললে, দেখাব কী?'

আমার প্রায় প্রেমে পড়ে যাবার মতো অবস্থা। ভবাপাগলার নাম শুনেছি, আমি এক প্রেম পাগলা। এই করেই আমার বউয়ের

প্রেমে পড়ে জীবনটা নষ্ট করেছি। মৃগাঙ্ক হতে হতেও হওয়া হল না। সংসারের ম্যাঁও সামলাতে সামলাতেই ঘাটে যাবার সময় হয়ে গেল। প্রবীণা এক মহিলা বললেন, 'সীমা ভদ্রলোককে ওই ওপরের থাকের শাড়িগুলো দেখাও।' চালাকিটা পরে বুঝলুম। আমাকে অপদস্থ করার জন্যে সবচেয়ে দামী দামী শাড়ি একের পর এক নেমে এল। সাড়ে চারশো, সাতশো, সাড়ে নশো।

আমি বললুম, 'আর একটু কম দাম ?'

'এ দোকানে কম দামের শাড়ি রাখা হয় না।' আমি সেই ক্ষয়া চাঁদের চোখের বাণে কাবু হলে কী হবে, তিনি আমার খাড়া নাকের আভিজাত্যকে মোটেই সমীহ করলেন না। আমি প্রায় মরিয়া হয়েই, সাড়ে চারশো দামের একটা শাড়ি কিনে ফেললুম। তখনও আর একজনের ওপর বদলা নেওয়া বাকি ছিল। ওই সেই দ্বারপাল। শাড়ির প্যাকেট বদলে নিয়ে আমি তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। আমি আগেই দেখে রেখেছিলুম, সে পাইপকে উঠে দাঁড়িয়ে, দরজা খুলে ধরে সেলাম করেছিল। বললুম, 'গেট আপ।'

লোকটি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। ধমকের সুরে বললুম, 'গেট আপ।' তখন আমার সংহার মূর্তি। উর্দি উঠে দাঁড়াল। 'দরওয়াজা খোল।' দরজা খুলে ধরল। তখনও তার আর একটা কাজ বাকি। 'স্যালুট। সেলাম বাজাও।'

সেলাম করল। আমি সেই পাইপ দাদার মতো গ্যাটম্যাট করে বেরিয়ে এলুম। লোকটা মহা শয়তান। আমার শরীরটা পুরো বেরোবার আগে, দরজাটা ছেড়ে দিল। কড়া স্প্রিং। দুম্ করে দরজাটা আমার পায়ের গোড়ালিতে ধাক্কা মারল। মারুক। আমি আমার পাওনা আদায় করে নিয়েছি।

এই এত বড় একটা ভণিতার কারণ, আমার দুঃখ। লোকটাকে কেউ সামান্যতম পাত্তা দেয় না। না বাড়ির লোক, না বাইরের লোক! কেন? কারণটা কী? এক জ্যোতিষীকে বলেছিলুম, 'একবার দেখুন তো মশাই হরোসকোপটা। কোথায় কোন্ গ্রহ এঁকে বেঁকে আছে।'

অনেক অঙ্কটঙ্ক কষে তিনি বললেন, 'আপনার রবিটা খুব

ড্যামেজ হয়ে আছে, যে কারণে চামচিকেতেও আপনাকে লাথি মারবে। মটরদানার মতো একটা হীরে পরুন।' হীরে পরব আমি! আমি কি মৃগাঙ্ক? দশ, বারো, চোদ্দ, কত হাজার পড়বে কে জানে! মারুক চামচিকিতে লাথি। যাক, যে কথা বলছিলুম, মিনি থেকে নেমে আমাকে এ দোকান, সে দোকান ঘুরে ঘুরে জিনিস কিনতে হবে। কেরোসিন কুকারের পলতে, চিঁড়ে, ছোলা, বাতাসা, বাদাম, মাথাধরার ওষুধ, সেজের চিমনি, মুরগীর ডিম, পুজোর ফুল। কেনাকাটার কোনও মাথামুন্ডু নেই। নিতান্তই মধ্যবিত্তের জিনিস। মৃগাঙ্কর প্যাটিস, প্যাস্ট্রি নয়। আর সবই বিপরীতধর্মী জিনিস। ফুলের সঙ্গে ডিম ঠেকবে না। বাতাসায় চাপ পড়বে না। চিমনি চাপ সইবে না। এ সবই আমার প্রেমের বউয়ের কারসাজি। রোজই এমন সব জিনিস আনতে বলবে, মানুষের দু'হাতে ম্যানেজ করা অসম্ভব। দশটা হাত, দশটা মুন্ডু হলে যদি সব কিছু করা যায়। এ সংসারে রাম হলে কপালে বনবাস। রাবণ হতে হবে। রাজ্যপাট, লোভনীয় পরস্ত্রী, সবই তখন সম্ভব। রাম হলে ভোগান্তি। রাবণ হলে ভোগের চূড়ান্ত।

দু'হাতে বুকের কাছে সব পাকড়ে ধরে বাড়িমুখো হাঁটতে হাঁটতে বলি, 'আই অ্যাম এ ডিগনিফায়েড ডঙ্ক।' ফাইন্যাল খেলা শুরু হয় বাড়ির সামনে এসে। রবি নীচস্থ হলেও, মঙ্গল আর শুক্র মনে হয় তুঙ্গী। বরাতে বাড়িটা মোটামুটি ভালই জুটেছে। সামনে একটু বাগান মতো আছে। গেট। গেট থেকে সিমেণ্ট বাঁধানো রাস্তা সোজা সদরে। আমার বউয়ের এদিক নেই ওদিক আছে। নিজে পায় না খেতে শঙ্করাকে ডাকে। লোমঅলা ফুটফুটে সাদা একটা কুকুর কিনে এনেছে। তিনি যেন গৃহ-দেবতা! তাঁর সেবার শেষ নেই। তিনি সকালে চুকচুক করে আধবাটি দুধ খাবেন। নিজে খাই না খাই ডেলি এক শো গ্রাম ক্রিম ক্র্যাকার বাঁধা। ঝড় হোক, জল হোক, রাষ্ট্রবিপ্লব হোক, এমন কি অ্যাটম বোমা পড়লেও ডেলি দুশোগ্রাম কিমা। মাসে ডাক্তার বদ্যি, ওষুধ-বিষুধের পেছনে অ্যাভারেজ পঞ্চাশ টাকা। নিজে অসুস্থ হলে পড়ে থাকা যায়। কেউ গ্রাহ্যই করবে না।

তুমি ব্যাটা মরে ভূত হয়ে যাও, কিছু যায় আসে না। ঘটা করে শ্রাদ্ধ করে, পাস বই নিয়ে ব্যাঙ্কে ছুটব। অ্যাকাউণ্ট ট্রান্সফার করাবার জন্যে। তুমি তো আর লোমঅলা বিলিতি কুকুর নও। হিন্দি ছায়াছবিতে যেমন গেস্ট আর্টিস্ট থাকে, আমাদের সেইরকম গেস্ট কুকুর আছে। সে আবার আর এক ইতিহাস! কে বলে ইতিহাসে কেবল রাজা-রাজড়া? সাধারণ মানুষের জীবনে কম ইতিহাস? বছর দশেক আগে এক বর্ষার রাতে রাস্তার লালু এসেছিল বাইরের বারান্দায় আশ্রয় নিতে। সেই লালু হয়ে গেল গেস্ট। লালুর চারটি বাচ্চা হল। দুটো মরল, দুটো রইল। মারা গেল লালু। কাল্লু আর গুগলু বড় হল। তাদের হল চারটে চারটে আটটা। তিনটে গেল রইল পাঁচটা। সে এক জটিল হিসেব। তবে এখন যা অবস্থা, পিল পিল করছে কুকুর। রাতে কানে তুলো গুঁজে, দরজা জানালা বন্ধ করে শুতে হয়। মিনিটে মিনিটে ডাক। প্রথমে একটা ডাক, তারপর সব কটা কোরাসে। শুরু হলে আর শেষ হতে চায় না, সভাপতির ভাষণের মতো। আমার বউ বলবে, 'কি আশ্চর্য! কুকুর ডাকবে না! ডাকবে বলেই তো রোজ দেড় কেজি চালের ভাত খাওয়াই। বাঙালীর বাত, কুকুরের ডাক।' বেশ বাবা, তাই হোক। তা কিন্তু হল না। মালকিন নিজেই এবার কুকুরের ওপর খাপ্পা। কুকুরের খেলা পায়। খেলার আনন্দে তারে ঝোলা শাড়ি, ছিঁড়ে ফালা করেছে। দরজার পাপোশ আঁচড়ে আবার র-মেটিরিয়াল করে দিয়েছে। এই সব অপকর্ম যদিও বা সহ্য হল, হল না সেই মারাত্মক অপরাধ। গেস্ট আর্টিস্টরা একদিন বাড়ির লোমঅলা হিরোকে বাগে পেয়ে খাবলে দিলে। এখন নিয়ম হয়েছে, যে-ই আসুক আর যে-ই যাক গেট বন্ধ করতে হবে। সেও আবার এক ইতিহাস। লোয়েস্ট কোটেসানের লোহার গেট। লোহা মানে সরু সরু কতকগুলো শিক সরু পাটির ফ্রেমে ঢালাই করা। বাতাসে ম্যালেরিয়া রুগির মতো কাঁপে। ফুঁ দিলে খুলে যায়। ফলে ব্যবস্থা যা হয়েছে, তা অভিনব। অন্ট গণ্ডা গাঁটঅলা, একটা দড়ি দিয়ে গেটটা বাঁধা হয়। বাঁধা সহজ। যে বাঁধে সে বাঁধে। শ্যামল মিত্রের সেই গান, ফুলের বনে মধু নিতে অনেক

কাঁটার জ্বালা, যে জানে সে জানে, ভ্রমরা যাস নে সেখানে। খুলতে পিতার নাম ভুলিয়ে দেয়। গেঁটে বাতের মতো।

মৃগাঙ্ক যখন ফেরে তাকে রিসিভ করার জন্যে একটা ব্যাটেলিয়ান খাড়া থাকে গার্ড অফ অনার দেবার জন্যে। আমি তো আর মৃগাঙ্ক নই। ছেলেবেলায় একটা ছবি দেখেছিলুম কোনও বইয়ে, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ। বুকের কাছে দু'হাত দিয়ে দলা পাকানো কাপড় ধরে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি আর রাজার পোশাক-পরা গুঁপো একটা গুন্ডা, হয় দুঃশাসন না হয় দুর্যোধন, আঁচল ধরে টানছে। আমাদের বাড়ির গেটের সামনে আমারও সেই অবস্থা। বুকের কাছে দু'হাতে জাপটে ধরা প্যাকেট ম্যাকেট। কাঁধে সাইড ব্যাগ, সামনে গেঁটে বাত। গেঁটে দড়ি বাঁধা ম্যালেরিয়া গেট। আবার একটা গানের কলি, কেউ দেয়নি কো উলু, কেউ বাজায়নি শাঁখ। দু'হাতে যে বাঁধন খোলা যায় না, সেই বাঁধন খুলবো এক হাতে? আলিবাবা, চিচিংফাঁক মন্ত্র দাও!

বলে না, ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়। কে বলে বাঙালির ফেলো ফিলিংস নেই! খুব আছে। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে কেউ না কেউ আমার সাহায্যে এগিয়ে আসে। আমি ভাবি কত ভাবেই না মানুষ রোজগার করতে পারে। আমার ফেরার সময় খোকন জেগে গেছে। সেও এক ইতিহাস। খোকন খাঁড়ার বাবার ছিল সাবেক কালের বিশাল গোলদারী দোকান। প্রভূত পয়সার মালিক। পয়সা হল ভূত। ভূতে ধরলে মানুষের মতিভ্রম হয়। বড় খাঁড়া পর পর তিনটে বিয়ে করে ফেললেন। লোকে একটা বউয়ের হ্যাপা সামলাতেই হিমসিম খেয়ে যায়। সব হ্যাপিনেস, গাং গঙ্গায়ৈ নমঃ। বড় খাঁড়ার চুল উঠে গেল। মুখ ফুলে গেল। ভুঁড়ি বেড়ে গেল। আমরা ভাবতুম সুখে বড় খাঁড়া মোটা হচ্ছে। তা নয় খাঁড়ার উদরি হয়ে গেল। খাঁড়া মরে গেল। লোকে মরলে একটা বউ বিধবা হয়। খাঁড়া তিন তিনটেকে বিধবা করে পগার পার। তারপর যা হয় বিষয় বিষ। মামলা, মকদ্দমা, মারদাঙ্গা। গোলদারী ভুস। বড় পক্ষের ছেলে খোকন খাঁড়া, খাঁড়া হলে কী হবে, ধার নেই। পথে পড়ে গেল। কল্কে

ধরলে। অন্যের কল্কে ধরলে লোকের আখের ফেরে। নিজের কল্কে ধরলে সর্বনাশ হয়। খোকন এখন আধপাগলা। শুধু ধান্দা, কীভাবে গাঁজার পয়সা জোগাড় করা যায়। ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়।

সে আবার কী রকম কথা! বলি সে কথা। ভগবান আমার জন্ম দিলেন। বয়েস কালে বাবরি চুল রেখে আমি প্রেম করলুম। হ্যা-হ্যা করে বিয়ে করলুম। ধারদেনা করে বাড়ি করলুম। পয়সার অভাবে লগবগে গেট করলুম। বিজ্ঞান হাতে তুলে দিল টিভি। প্রবাদ, যত হাসি তত কান্না, বলে গেছে রাম শর্মা। যত প্রেম তত ঘৃণা। আমার বউ টিভি দেখবে। আমি গরু খেটে ফিরব। দু হাতে কলাটা মুলোটা। খোকন খাঁড়া সামনের বাড়ির রকে। সে নেমে আসবে, মেসোমশাইকে সাহায্য করতে। বিনিময়ে পঁচিশ পয়সা। এক পুরিয়া গঞ্জিকার দাম?

একেই বলে কুকুর। আমার বউ আমার এই বেড়া-টপকানোর কিছুই জানতে পারবে না। পারবে লোমঅলা কুকুর। সে ঘেউ ঘেউ করবে। তাতেও আমার বউ উঠবে না। ভাগ্যিস ছেলেবেলায় ব্যাকে ফুটবল খেলেছিলুম। ডানপায়ে সদর দরজায় দমাদ্দম লাথি। তখন দরজা খুলে যাবে। কুকুর ছুটে আসবে। দু'হাত তুলে নাচবে। চাটার চেষ্টা করবে। আর আমার বউ হাসিমুখে অভ্যর্থনার বদলে, কি জিনিসপত্তর ধরে আমাকে খালাস করার বদলে একটি কথাই রুক্ষ গলায় বলবে, 'গেটে দড়ি বেঁধেছ? বাঁধনি। যাও বেঁধে এস।'

মালপত্তর কোনও রকমে নামিয়ে, আমি গান গাইব। মনে মনে। বাঁধো না তরীখানি আমার এই নদীকূলে। একা যে দাঁড়ায়ে আছি লহ না কোলে তুলে। তারপর ছুটব তলতা গেটে দড়ি বাঁধতে। ওই কাজটি করারকালে আমি দার্শনিক হয়ে যাব। মাথার ওপর মেরুন আকাশ। মিটিমিটি তারা। আমার বাগানের কৃষ্ণচূড়ার ঝিরি ঝিরি পাতা। অসংখ্য গাঁটঅলা একটা দড়ি, যেন হাতে ধরা জপের মালা। এক একটা গাঁট এক একটা রুদ্রাক্ষ। আমি তখন সত্যি সত্যিই তিন গাঁটে ওঁকার জপ করব। পা বাড়ালেই পথ। আমি তখন গাইব প্রশ্নের মতো করে—'কেন

রে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয় ?' আমি কোনও উত্তর খুঁজে পাব না ! মাথা নিচু করে ফিরে আসব। আমার কুকুর গাল চাটবে। মৃগাঙ্কের বিলিতি আফটার সেভিং লোশান আছে। সেটা থাকে শিশিতে। আমারও রয়েছে একটু অন্যভাবে। বিলিতি কুকুরের জিভে। ভাবামাত্রই আমার মন মসৃণ। মধ্যবিত্ত-মলিন-বাথরুমে ঢুকে কল ছাড়ব, আর ছাড়ব আমার ডাকাতে গলা—হারে রে রে রে রে, তোরা দেরে আমায় ছেড়ে।

———

খাটে বসে খেলা

আমি এত বড় একজন বিশেষজ্ঞ হলাম কি করে, এ প্রশ্ন যদি কেউ করেন তাহলে বলব, আমার সাধনভূমি হল খাট আর উপকরণ হল গোটা চারেক বালিশ আর হাত চারেক তফাতে একটা টিভি। মাঠ নয়, ময়দান নয়, দুরূহ কোনও প্র্যাক্টিস সিডিউল নয়, স্রেফ আড় হয়ে শুয়ে শুয়ে, দু চোখ খোলা রেখে, আমি ফুটলবলার, ক্রিকেটার, টেনিস চ্যাম্পিয়ন। হকি ব্যাডমিণ্টন, কোনও খেলাই আর আমার অনায়ত্ত নয়। এমন কি বিশ্বের সেরা জিমন্যাস্ট। অবশ্য জিমন্যাস্ট হবার জন্যে প্রতিদিন আমাকে কড়া একটা প্র্যাক্টিস শিডিউল অনুসরণ করতে হয়। পি টি, উষা কি মহম্মদ আলির চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। এ আমাকে প্রাণের দায়ে করতে হয়। আমার ভাত-ভিক্ষা। না করলে হাঁড়ি চড়বে না। আসলে আমি একজন জিমন্যাস্ট। আর যে কোনও একটা দিকে প্রতিভার উন্মেষ হলেই তার সব আয়ত্তে এসে যায় একে একে। যেমন ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সায়েব সেতার-সরোদ এসরাজ মায় সব তারের যন্ত্র বাজাতে পারতেন, আবার গানও গাইতে পারতেন। প্রতিভা হল কর্পোরেশনের পাইপ-ফাটা জলের মতো। চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ ভাসিয়ে মহাজাতি সদনের পাশ দিয়ে কলাবাগান বস্তি ভেদ করে ঠনঠনিয়ায় মায়ের পায়ে আছড়ে পড়ে।

আমি জিমন্যাস্ট হতে চাইনি। যেমন চোরেরা থানা অফিসারকে বলে হজৌর আমি চোর হতে চাইনি। যেমন মাতাল, স্ত্রীর ঝ্যাঁটা পেটা খেতে খেতে বলে, মাইরি বলছি আমি ছুঁতে চাইনি, সাধনটা জোর করে খাইয়ে দিলে। আমি যে রাজ্যের ভোটার, রেশনকার্ড হোল্ডার, মানুষ আর বলব না, কারণ আমি, যাদের মানুষ বলে, অন্যান্য দেশে যাদের মানুষ বলা হয়, আমি সে দলে পড়ি না।

আমার রাজ্যে গত স্বাধীনতার পর থেকে, গত বলছি এই কারণে স্বাধীনতা মারা গেছে। এখন আমরা আর শৃঙ্খলমুক্ত নই

শৃঙ্খলামুক্ত অর্থাৎ বিশৃঙ্খল, তা সেই স্বাধীনতার পর থেকে এ রাজ্যে সর্ব-ব্যাপক-অ্যাথলিট-তৈরি-প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এমন কায়দায় করা হয়েছে, কারুর বোঝার উপায় নেই। সকাল-বিকেল ট্রেনিং হয়ে যাচ্ছে। ছেলে, বুড়ো, মেয়েমদ্দ কেউ বাদ পড়েনি। এই ট্রেনিং-এর যিনি ডিরেক্টার, তাঁর মত কোচ পৃথিবীতে আর দুটি নেই। তিনি অদৃশ্য, অথচ ট্রেনিং পুরোদমে চলছে। নিজেরাই নিজেদের ট্রেনিং দিচ্ছে। ইংরেজি করলে দাঁড়ায়, সেলফ-প্রপেলড ট্রেনিং কোর্স। কবীর সাহেব গান লিখেছিলেন, যার ভাবটা ছিল এইরকম, আকাশ আর ভূমি দুটো বিশাল চাকি, সেই দুই চাকির মাঝখানে মানুষ যেন গমের দানা, অহরহ পেষাই হয়ে চলছে। অদৃশ্য চাকির মতো, প্রচ্ছন্ন প্রশিক্ষণ প্রকল্প। কেউ জানল না, কেউ বুঝল না, অ্যাথলিট হয়ে গেল, জিমন্যাস্ট হয়ে গেল। সকালবেলা অফিস যেতে হবে, ব্যবসায় বেরোতে হবে। জীবিকার সন্ধানে সুস্থ সমর্থ মানুষকে বেরোতেই হবে। বাস ট্রাম, ট্রেন ধরতেই হবে। না ধরে উপায় নেই। উপোস ক'রে মরতে হবে। পৃথিবীর সব সভ্য দেশে কি হয়! ঝকঝকে, তকতকে একটা বাস স্টপেজে এসে দাঁড়ায়। মানুষ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকে। টুক্‌টুক্ করে একজন উঠে পড়ে। বাস ছেড়ে দেয়। আমাদের সিস্‌টেম অন্যরকম। অনেকে মনে করেন, এ আবার কি! এ আবার কি মানে! আমরা অ্যাথলিট চাই। স্বামী অ্যাথলিট, স্ত্রী অ্যাথলিট, ছাত্র, শিক্ষক, বড়বাবু, ছোটবাবু, জামাইবাবু, কামাইবাবু, হেঁপো রুগী, বেতো রুগী, ইচ অ্যান্ড এভরিওয়ান, হবে জিমন্যাস্ট।

সেই কারণে, আমাদের দৃশ্যটা হয় এই রকম : বাস আসছে। বাস আসছে, না তাল তাল মানুষ আসছে বোঝার উপায় নেই। ইঁদুর ধরা কলের মতো। এদিকে ঝুলছে, ওদিকে ঝুলছে। এদিকে মাথা, ওদিকে পা। ন্যাল ব্যাল, ঝ্যাল ঝ্যাল বাঙালি পাঁঠার দোকানের রেওয়াজী মালের মতো। আর কি! সামনের আর পেছনের গেটে দুই ওস্তাদ হাতল ধরে জানালার রড ধরে, কখনো ঝুলে, হাত তুলে, পা তুলে, ডিগবাজি খেয়ে, চিৎকার করে, আশ-পাশের লোকের পিলে চমকে দিয়ে কর্পোরেশনের কুকুর ধরা গাড়ির

মতো, কি একটা সামনে এসে হ্যাঁচকা মেরে থামল। অনেকের সঙ্গে আমিও দাঁড়িয়ে আছি। এই সময় আমি, টেনিস আর ফুটবল দুটোকে এক সঙ্গে পাঞ্চ করে টেনিফুটুস খেলি। সেটা কি! ওই খাট আর টিভি চাই। এ খেলার কোনও গ্রামার নেই। কোনও কোচ নেই। খাটে বসে, টি ভি দেখে শিখতে হয়।

নাভ্রাতিলোভার খেলা দেখতে হবে। এ পাশে তিলোভা, ওপাশে মার্টিনা। মার্টিনা সার্ভিস করছেন। তিলোভা এপাশে কি করছেন? ভালভাবে লক্ষ্য করুন। তিলোভা সামনে ঝুঁকে পড়েছেন। পেছনেটা দুলছে। কিভাবে দুলছে! দুটো বাচচা বেড়াল যখন খেলা করে তখন একটা আর একটার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে পেছনটা যেভাবে দোলায় ঠিক সেইভাবে। বাস আসছে। আমি সামনে ঝুঁকে পড়ে পেছন দোলাচ্ছি। মার্টিনার সারভিস আসছে। খপ করে বাসের হাতলটা ধরতে হবে, তারপর ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবলের কায়দা। ডাইনে বাঁয়ে ডজ করে গোলে ঢুকে যাও। ভেতরে ট্রাপিজের খেলা। ফ্রিস্টাইল রেসলিং। সামারসল্ট। সব মিলিয়ে পরিপূর্ণ একটি ওলিম্পিক।

জাতীয় পরিকল্পনায় আমরা যেটার ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছি, সেটা হল ধৈর্য আর সহিষ্ণুতা। দাঁড়িয়ে থাকো। বাসের জন্যে দাঁড়াও। দাঁড়িয়েই থাকো। গ্যাসের লাইনে দাঁড়াও। গ্যাসের সঙ্গে ওয়েট লিফটিংও জুড়ে দেওয়া হয়েছে। আজকাল রিকশায় খালি সিলিণ্ডার চাপিয়ে ডিপোয় নিয়ে যেতে হয়। সিলিণ্ডার নামানো, সিলিণ্ডার ওঠানো একটা ভাল ব্যায়াম। হাতের গুলিটুলি বেশ ভালো হয়। ঘাড়ের ব্যায়াম হয়। এই কাজটা আজকাল মেয়েদেরই করতে হয় বেশির ভাগ। ফলে মেয়েদের স্বাস্থ্য আজকাল ভালই হচ্ছে। কেরোসিনের লাইন। ব্যাঙ্কের কাউণ্টারে লাইন। রেশনের দোকানে লাইন। দাঁড়াও। দাঁড়িয়ে থাকো। এই দাঁড়িয়ে থাকার ফলে পায়ের গুলো বেশ ভাল হচ্ছে। কোমরের জোর বাড়ছে। আর বাড়ছে ধৈর্য। মায়েদের স্কুলে ছেলেমেয়ে নিয়ে যাওয়া তারপর ছুটির আগে গেটের সামনে তীর্থের কাকের মতো দাঁড়িয়ে থাকা। এ সবই হল ওই বৃহত্তর জাতীয় পরিকল্পনার অঙ্গ। খেলোয়াড় তৈরী করো।

মাঠে-ময়দানে যাবার দরকার নেই। খাটে বালিশের পর বালিশে পিঠ রেখে বোসো ঠ্যাং ছড়িয়ে, সামনে খুলে রাখো টি. ভি। একদিনের ক্রিকেট তো অনবরতই হচ্ছে। আগে কলেরা-টলেরা হলে বলতো, মড়ক লেগেছে। এ যেন ক্রিকেটের মড়ক। কোনও কিছু করার উপায় নেই। টি. ভি-র সামনে থেকে নড়ার উপায় নেই। সকাল ন'টা পনের কি দশটা। বাজার করা কি দোকান করা মাথায় উঠে গেল। দাড়ি কামানো বন্ধ। এমন কি নাওয়া-খাওয়া মাথায় উঠে গেল। যা হয় ভাতে ভাত করেই ছেড়ে দাও। হোল ফ্যামিলি সারি দিয়ে টি. ভির সামনে। কত বড় সমস্যা! গ্যাভাসকার কেন যে তেড়ে মারছেন না। এই ঠুক ঠুক করে খেলার সময়। মাঠের সঙ্গে ডিরেক্ট টেলি-লিঙ্ক থাকলে, আমার উপদেশ ছুঁড়ে দিতুম, এটা আপনার টেস্ট নয়। আর রেকর্ডে দরকার নেই। আপনার ওই এক দোষ, একের পর এক কেবল রেকর্ড করার চেষ্টা। মারশালের বল কি ওভাবে মারে! ফাস্ট বলে খেলার নিয়ম হল, উইকেট ছেড়ে বেরিয়ে আসুন, খুব বেশী না, সামান্য কয়েক পা, তারপর হাঁকড়ান। একেবারে তছনছ করে দিন। মারুন ছয়। ছয়ের পর ছয়। তারপর ছয়। মেরে গ্যালারিতে পাঠিয়ে দিন। 'এই বলটা মনে হয় হুগলি ছিল।' 'হুগলি নয় গুগলি।' 'গুগলি কি করে ছাড়ে?'

'খুব সোজা, বলটাকে ছাড়ার আগে আঙুলের কায়দায় নিজের দিকে টেনে দেয়।' 'তার মানে ওইদিকের উইকেটে না গিয়ে এই দিকের উইকেটে চলে আসে।' 'ওইটাই তো কায়দা। এগোতে পেছোতে, পেছোতে এগোতে মানে সেই গানটার মতো, যাবো কি যাবো না, পাবো কি পাবো না, হায়!' 'আর স্পিন?'

'ভেরি সিম্পল। বলটাকে আঙুলের কায়দায় লাট্টুর মতো ঘুরিয়ে দেয়।' 'কি আঙুল, ভাবা যায়, কি করে শেখে?' 'কেন, কলকাতায় এলেই শিখে যাবে। প্রেমিকাকে ফোন করার জন্যে টেলিফোনের ডায়াল ঘোরাবে। ঘোরাতেই থাকবে। প্রতিবারই খট। নো কানেকসান। আবার ঘোরাবে। আবার আবার। একদিনেই স্পিন বোলার। 'আর লেগ-ব্রেক!'

'খুব সোজা, ব্যাটসম্যানের পা লক্ষ্য করে বল ছোঁড়া। সায়েবরা

একটা শাস্ত্র বানিয়ে ব্যাপারটাকে কি না কি করে তুলেছে! আসলে কিছুই নয়। ঢিল ছুঁড়ে আম পাড়ার মতো স্টাম্প পাড়া, কথা ছুঁড়ে যৌথ পরিবার ভাঙার মতো উইকেটের যৌথ পরিবার ছিটকে দেওয়া। খেলা তো আর জীবনের বাইরে নয়, জীবনটাই খেলা। এই খেয়ালটা রাখতে পারলেই খেলোয়াড়। যেমন নিজের জান সম্পর্কে যে সচেতন, সে জানোয়ার। লোহালক্কড় ছাড়া যে ভাবতে পারে না, সে কালোয়ার। যুদ্ধের ইংরেজি হল ওয়ার। ওয়ার প্রত্যয়ান্ত শব্দই হল খেলোয়াড়।

ভারত হল ক্রিকেট, ফুটবল আর হকির দেশ। হকিতে আজকাল আমরা প্রায়ই হেরে ভূত হয়ে যাই। হকি আর বাঙালীর একই হাল। দুটোরই এক সময় খুব গর্ব ছিল। সেই গৌরব ভাঙিয়ে আজও চলছে। তবে হকি পশ্চিমবাংলায় তেমন পপুলার হয়নি। অদ্ভুত এক দুর্বোধ্য খেলা। বলটা এত ছোট, চোখে পড়ে না। শুধু লাঠি হাতে পাঁই পাঁই দৌড়। আর গোলকিপারকে এমন অসহায় মনে হয়। সে বেচারার কিছুই করার থাকে না। পায়ে ইয়া দুই লেগগার্ড পরে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। হকি পপুলার না হলেও হকি স্টিক এক সময়ে খুব কাজে লাগত। মারামারি করার জন্যে, মাথা ফাটাফাটি করার জন্যে! পরমাণু বোমা জন্মাবার পর যেমন কামান, গোলাগুলির যুদ্ধ প্রায় অচল হয়ে এল, সেই রকম ছুরি ব্লেড, চপার, বোমা, পাইপগান এসে হকি স্টিককে অচল করে দিয়েছে। ক্রিকেটের আলাদা একটা ইজ্জত! পরশপাথর যা ছোঁয়, তাই সোনা হয়। ইংরেজ যা নাড়াচাড়া করে তাই জাতে উঠে যায়। তারা যদি ড্যাং-গুলি খেলত তাহলে ড্যাং-গুলিরও টেস্ট সিরিজ হত। কলকাতার অধিকাংশ বাইলেন এখন ক্রিকেট সাধনার পিচ। যে কোনও খেলারই কিছু টার্মস জানা থাকলেই সমঝদার। যেমন ক্রিকেটে মাঠের কোন্ পজিশানের কি নাম মুখস্ত করতে হবে। চেনার দরকার নেই। কণ্ঠস্থ করলেই হবে। স্লিপ, গালি, পয়েণ্ট, কভার পয়েণ্ট, একস্ট্রা কভার, মিড অফ, সিলি মিড অফ, মিড অন, সিলি মিড অন, লং অন, লং অফ, শর্ট লেগ, স্কোয়ার লেগ, ডিপ স্কোয়ার লেগ, ডিপ ফাইন লেগ। জানতে হবে বল করার ধরনে

কিছু নাম, গুগলি, ইয়র্কার, স্পিন, লেগব্রেক। আর কি! কেউ তো আর বলছে না, তুমি খেলে দেখাও। তুমি করে দেখাও।

আমি তো খাটে বসে আছি। পিঠে তিন থাক বালিশ। সামনে টি. ভি। ইণ্ডিয়া ভার্সাস ওয়েস্ট ইণ্ডিজ। ঘরে আরও অনেক দর্শক। ওই সব নাম মাঝে মাঝে বলতে হবে। 'দেখছো, দেখছো, বলটা, ইয়র্কার।' শ্রীকান্তের দোষ কি, ইয়র্কার খেলার ক্ষমতা ব্রাডম্যানেরও ছিল না।' 'কপিলের উচিত আজহারকে স্লিপ থেকে গালিতে সরিয়ে আনা।' কেউ চ্যালেঞ্জ করবে না, বলটা ইয়র্কার ছিল কি না। গুগলি কি না। মাঠে খেলা খুবই কঠিন। খাটে খেলা খুব সহজ। স্মরণশক্তি থাকলেই হয়ে গেল। তখন আর হাতের খেলা নয়, মাথার খেলা। টেস্ট ক্রিকেটের অতীত কিছু রেকর্ড মনে রাখতে হবে। কথা বলতে হবে জোর দিয়ে। আর তো কোনও কিছুর প্রয়োজন নেই। সত্যি খেলোয়াড় হলে পলিটিক্সের মধ্যে পড়তে হবে। তা না হলে, ইণ্ডিয়ান টিমে কেন বাঙালী নেই। গাভাসকারে কপিলে মাঝে মাঝেই কেন সঙ্ঘর্ষ! কেন একবার এ বসে তো ও ওঠে, ও ওঠে তো সে বসে। সিনেমার মতো ক্রিকেট-গসিপে কাগজ ঠাসা। আমার খাটেই ভালো। আর ভালো কিছু বই, ব্লাসটিং ফর রানস, সানি উইকেট।

ফুটবল তো আমাদেরই খেলা। তবে মুশকিল বাধিয়েছে আমার খাট আর টি ভি। দুটো ওয়ার্ল্ড কাপ দেখে আমাদের খেলায় আর খেলা পাই না। কথায় কথায় মারাদোনা, সক্রেটিস। আমাদের এখানে খেলোয়াড় যত না খেলে, বেশি খেলে সাপোর্টার। কিছু খেলা আছে যেমন ফুটবল, ক্রিকেট, যার ওপর ঝোঁক না থাকাটা ইজ্জতের প্রশ্ন। আভিজাত্য। ব্লাড সুগার, প্রেসার, হার্ট ডিজিজ হল অ্যারিসট্রোক্র্যাসির লক্ষণ, সেই রকম ফুটবল আর ক্রিকেট। ফুটবলে দুটো বড় দলের যে কোনও একটি দলের সাপোর্টার হতে হবে। আর গোটাকতক টার্মস শিখে রাখতে হবে, যেমন, অফসাইড, ডিফেন্স, ফরওয়ার্ড লাইন, রাইট ইন, রাইট আউট, টাইব্রেকার। এর মধ্যে অফসাইডটা অবশ্যই জানতে হবে। মাঝে মাঝে খেলা দেখতে দেখতে বলতে হবে অফসাইড, অফসাইড। অফসাইড না বললে ভালো রেফারি হওয়া যায় না, বিশিষ্ট দর্শক হওয়া যায়

না। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে মাঝে মাঝে মাথা দোলাতে হয়, অহো অহো করতে হয়। ফুটবলে সেই রকম অফসাইড। এবারের বিশ্বকাপে, কোনও খেলোয়াড়েরই তো, বিপক্ষের গোলের কাছাকাছি যাবার উপায় ছিল না। এগিয়েছে কি অফসাইড। চেষ্টাচরিত্র করে যাও বা একটা গোল দিলে, অফসাইড। হয়ে গেল। আপদ চুকে গেল। অফসাইডের মতো জিনিস নেই। সব সাধনা এক কথায় পণ্ড। সাধকরা বলেন, সংসার থেকে দূরে থেকে সংসার করাটাই বেদান্তের একটা পথ। নির্লিপ্ত। নিরাসক্ত। তাঁরা উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন, 'মনে করো তুমি একটা সিনেমা দেখছ। সিনেমা দু'ভাবে দেখা যায়। সিনেমার চরিত্রে নিজেকে হারিয়ে ফেললে, কখনো হাসবে, কখনো কাঁদবে, আতঙ্কের দৃশ্যে চেয়ারের হাতল চেপে ধরবে। সারাক্ষণ সে এক যন্ত্রণা! কিন্তু যদি মনে রাখা যায়, আরে এ তো সিনেমা, এ তো মায়া, তাহলে আর কিছুই হবে না। তখন চোখ আর মন দুটোই যাবে সমালোচনার দিকে। কার অভিনয় ভালো হল। কার ঝুলে গেল! কাহিনীটির ত্রুটি কোথায়। সুর কেমন। পরিচালনা কেমন! খেলা তো খেলার খেলা। বেদান্ত বলছেন, জীবন হল মায়া, অভিনয়, খেলা স্বপ্ন। ইংরেজ সেক্সপীয়ার বলছেন, লাইফ ইজ এ স্টেজ। শাক্ত কবি বলছেন, জীবন রঙ্গমঞ্চ।

সেই জীবন খেলায়, ফুটবল, ক্রিকেট হল খেলারও খেলা। তার মানে তামাশার তামাশা, মহাতামাশা। টি. ভির পর্দাই হল খেলার উপযুক্ত স্থান। দূরে বসে ক্যামেরার চোখে দেখো আর মনে মনে খেলো। ওই যে কপিল ব্যাটটা তুলল, তারপর শরীরটাকে স্লাইট বাঁয়ে মুচড়ে সোজা করার সময় দ্বিধাটা কাটাতে পারলে ওইভাবে স্টাম্প ছিটকে যেত না। আমি হলে সোজা ছয় মেরে গ্যালারিতে ফেলে দিতুম। শ্রীকান্তের চোখ সেট হবার আগে লেগব্রেক ওভাবে মারলে আউট তো হবেই। আমি হলে আরও দু-চারটে মেরে তারপর চার কি ছয় মারবার চেষ্টা করতুম। আমরা আসলে অ্যাডভাইসারের জাত। উপদেষ্টা। কোনটা বেশি প্রয়োজনীয়। অ্যাকসন না অ্যাডভাইস! ভালো উপদেশ না পেলে জীবনে কিছুই করা যায় না। লেখাপড়া, কলকারখানা, মামলা-মোকদ্দমা,

চুরি ডাকাতি। ভালো উপদেষ্টার উপদেশ না নিলে সব ভেস্তে যায়। খাটে বসে টি. ভির পর্দায় খেলা না দেখলে খেলোয়াড়কে মানুষ করা যায় না। কোচ এত কাছে থাকেন, খেলার সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে থাকেন, তাঁর পক্ষে কি করলে কি হত, এই উপদেশ দেওয়া সম্ভব নয়। এ একমাত্র খাট-এক্সপার্ট'রাই দিতে পারে। আমরা সব সময় দিয়েও থাকি। খাটে বসে, গ্যালারিতে বসে দিয়েও থাকি, ও'রা শুনতে পান না। আমাদের উপদেশে চললে, কি ক্রিকেট, কি হকি, কি ফুটবল, আমরা হয়ে যেতুম অজেয়।

শুধু! এই শুধুটাই হল আসল, স্ট্যামিনা বাড়াতে হবে। স্বাস্থ্য ভালো করতে হবে। ষাঁড়ের ডালনা না কি বলে, খেতে হবে। তবে ভুঁড়ি বাড়ালে চলবে না। আমাদের কাল হল ভুঁড়ি। আমাদের জাতীয় পরিকল্পনায় অনবরত দৌড়ের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, বাসের পেছনে, ট্রামের পেছনে, ট্যাক্সি কি মিনির পেছনে। না দৌড়লে কিছুই ধরা যায় না। আরও ভালো দৌড়ের জন্যে নিয়মিত বোমাবাজি, লাঠিবাজি, টিয়ারগ্যাসের ব্যবস্থা তো আছেই আর আছে পথ-দুর্ঘটনার পর যানবাহনে ইটপাটকেল ছোঁড়া, আগুন, পুলিসের তাড়া। সারা দেশটাকে আমরা খেলার মাঠ করেছি। পথঘাট করে তুলেছি ট্রেকিং-এর উপযোগী। ধর্মতলা থেকে সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউ ধরে ব্রিজ পেরিয়ে বি. টি. রোড বরাবর ব্যারাকপুর যাত্রা, কোথায় লাগে, লে, লাদাখ, সন্দাকফু! তবু আমাদের ভুঁড়ি বাড়ছে। ইণ্ডিয়ান ফুটবল টিম প্রথম ৪৫ মিনিট বেশ দৌড়ঝাঁপ করে, তারপর সেকেণ্ড হাফে হাঁপায়। দরকার প্রাণায়াম। এই প্রাণায়ামের কথায় মনে পড়ল, আমরা সবাই ডাক্তার, সবাই অ্যাস্ট্রোলজার, আমরা সবাই যোগী। শশঙ্গাসন, ভুজঙ্গাসন, হলাসন, উষ্ট্রাসন, মুখে মুখে ফেরে। বাসে, ট্রামে, বাজারে এমন কি বিয়ের আসরে। কন্যা সম্প্রদান করতে গিয়ে মেয়ের মামা, চাদর গলায় জামাতার নাদুস ভুঁড়ির দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বললেন, বাবা, ফুলশয্যাতেই হলাসনটা শুরু করে দাও। আর পারলে শেষ রাতে উঠে পদহস্তাসন।

তবে খাটে বসে টি. ভি দেখতে দেখতে এক্সপার্ট'স কমেণ্টস করার দিন আমার শেষ হয়ে এল। গত বিশ্বকাপে সারা রাত ঠ্যাং-এর

ওপর ঠ্যাং তুলে টি. ভি দেখেছি। বোতলভরা জল ঢুকুর ঢুকুর খেয়েছি। আর বেলা অবধি ভোঁস ভোঁস ঘুমিয়েছি। এতে আমার পালিকার, অর্থাৎ আমি যাঁর গৃহপালিত, তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত হয়েছে। স্নায়ু উত্তেজিত হয়েছে। ফরাসি দেশ হলে আমার নামে লাখ টাকার ডেমারেজ স্যুট ঠুকে দিত। টি. ভিতে তালা মেরে এবার থেকে রেশনিং সিসটেমে, যেমন চাল গম চিনি ছাড়ে, সেই রকম প্রোগ্রাম ছাড়বে। সারা রাত হ্যা-হ্যা করা চলবে না।

———

নীপার বক

একেবারে লণ্ডভণ্ড অবস্থা। যেন প্রলয়। চারপাশে থই থই জল। রাস্তাঘাট নেই। সব মুছে গেছে। ঘোর অন্ধকার। মাথার ওপর ঝুলছে রান্নাঘরের ছাদের মতো কালো, নোঙরা আকাশ। অসংখ্য গাড়ি অচল হয়ে পড়ে আছে। বৃষ্টি ভেজা গাড়ির চাল সৈনিকের মাথার হেলমেটের মতো চকচক করছে। কি অবস্থা। এখন দেখছি, সেকালের ডাকাতদের মতো এক জোড়া রণপা কিনতে হবে। রোববার রোববার, বাড়ির পাশের ফাঁকা মাঠে অভ্যাস করতে হবে। তা না হলে চাকরি-বাকরি আর করা যাবে না।

'তা কতক্ষণ হবে মশাই আটকে বসে আছি। আমার ঘড়িটা আবার গত রবিবার মেচেদা লোকালে সাঁতরাগাছির কাছে ছিনতাই হয়ে গেছে।'

ওপাশের ভদ্রলোক বললেন, 'তা দেড়ঘণ্টা হল।'

'দিস ইজ ক্যালকাটা। দিস ইজ ইওর ক্যালকাটা। এই দেড়ঘণ্টায় প্লেনে দিল্লি চলে যাওয়া যায়। রাজীব নিশ্চয় এখন ডিনার খাচ্ছে।'

'আর আমাদের মুখ্যমন্ত্রী! একবার দেখুন না মশাই উঁকি মেরে, জলের লেভেলটা। টনসিল টাচ না করলে নেমে পড়ি।'

'তারপর?'

'খপাত খপাত।'

'শেষে গর্তে ঘপাত। অ্যাকসিডেণ্ট ইনসিওরেন্স করা আছে।'

'তা হলে চুপচাপ বসে থাকুন। বসার জায়গা পেয়েছেন, ঘুমিয়ে পড়ুন। কাল সকালে পেছন ফিরে বসবেন, অফিস পৌঁছে যাবেন। ঘণ্টাখানেকের জন্যে বাড়ি ফিরে অশান্তি বাড়িয়ে লাভ কি! আজ তো আর মাস পয়লা নয় যে, এসো হে, এসো হে

বলে, ভিজে ঢোল, কাদা-মাখা মালটিকে কোলে তুলে নেবে, আর জিজ্ঞেস করবে, হ্যাঁগা, শুকনো আছে তো, ভেজেনি তো? তুমি ভিজে ব্লটিং মেরে যাও ক্ষতি নেই। মাইনেটর টাকাটা যেন শুকনো থাকে।'

পেছনের সিটে এই সব রম্য আলোচনা হচ্ছে। তার সামনের জোড়া আসনে এক জোড়া কপোতকপোতী। মাথায় মাথা ঠেকাঠেকি করে ভি হয়ে বসে আছে। তাদের কাছে এই জল, এই আটকে যাওয়া বাস যেন বিধাতার আশীর্বাদ। প্রেমিক-প্রেমিকাদের পেটে যে কত কথা জমে থাকে! শেষ আর হয় না। প্রেমালাপ আর ঝগড়া দুটোরই আদি অন্ত থাকে না। আজকাল আবার জনসমক্ষেই সব চলে। সেদিন দেখি রাজধানী এক্সপ্রেসের প্রবেশদ্বারে ঠোঁটে ঠোঁট লক করে একজোড়া পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে। কে একজন বললেন, 'এই কি এই করার জায়গা?' সঙ্গে সঙ্গে উত্তর, 'সিনেমায় চুম্বন সেনসার আর কাটছে না।'

তার সামনের আসনে এক ভদ্রলোক পকেটবুক বের করে হিসেব লিখছেন। বোধহয় লোহার কারবারী। লোহা এখন সোনা। সে যুগে মানুষ সোনার সন্ধানে ছুটত, এ যুগের মানুষ ছুটছে পার্কের রেলিং খুলতে, ম্যানহোলের ঢাকনা সরাতে। প্রস্তরযুগ, স্বর্ণযুগ সব যুগ শেষ হয়ে এখন পড়েছে লৌহ যুগ আর চুল্লুর যুগ। সিনেমার নায়ক গান ধরে, চুল্লু খাও চুল্লু, চুল্লু খাও চুল্লু, আর ইয়ং অডিয়েন্স্ তাল মারে।

আমার বাঁপাশের ভদ্রলোক মিনিট পনেরো আগে তোফা নস্যি টেনে দিব্যি ঘুমোচ্ছিলেন, হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসে চিৎকার ছাড়লেন, 'হ্যাঁ গা, ঘরের জানলা বন্ধ করে এসেছিলে?'

ও মাথা থেকে নারীকণ্ঠ ভেসে এল, 'না, একটা খুলে রেখে এসেছিলুম।'

ভদ্রলোক স্ত্রীর গলা নকল করে বললেন, 'খুলে রেখে এসেছিলুম! বেশ করেছিলে। গিয়ে দেখবে সব কালিয়া হয়ে গেছে।'

ও মাথা হেঁকে উঠল, 'কে জানত এমন বৃষ্টি নামবে। আমি কি জ্যোতিষী!'

ইনি সঙ্গে সঙ্গে ছক্কা মারলেন, 'তুমি আমার নিয়তি।'

বাসের পেট থেকে অদৃশ্য কণ্ঠ উৎসাহ দিল—'চালিয়ে যান দাদা, জ্বালাময়ী জ্বালিয়ে দিন।' ভদ্রলোক একটু দমে গেলেন। আবার এক টিপ নস্যি নিয়ে আপন মনে বললেন, 'যাঃ শালা, মরগে যা। আমার কি। বিছানা পান্তুয়া হয়ে গেল। ধরবে যখন বাতে, তখন মুখের বাত বেরিয়ে যাবে।'

আবার বেশ তোড়জোড় করে ঘুমোবার তালে ছিলেন, ও মাথা থেকে নিয়তির কণ্ঠ ভেসে এল, 'ছাতাটা তুলেছিলে তো!'

ভদ্রলোক কেমন যেন চুপসে গেলেন, খোঁচা খাওয়া বেলুনের মতো। আমতা আমতা করে বললেন, 'ছাতা?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ছাতা। জানি জানি, ওটা যখনই তোমার হাতে গেছে তখনই আমি জানি মায়ের ভোগে।' মেয়েরাও আজকাল মর্ডান ল্যাঙ্গোয়েজ শিখে গেছে।

ভদ্রলোক বললেন, 'ওটা তা হলে সোনাদের বাড়িতেই পড়ে রইল।'

'আজ্ঞে না, ওদের বাড়ি থেকে যখন বেরলে তখন ছাতা তোমার হাতে। সে ছাতা এখন বেহালার ট্রাম চাপছে।'

আমি বললুম, 'বেকায়দায় পড়ে গেছেন দাদা। এবার আপনি শুয়ে পড়ুন।'

ভদ্রলোকও কম যান না। ইনি হলেন সেই টাইপ। 'হারবো বললেই হারেগা, থামচে খুমচে মারেগা।' চিৎকার করে বললেন, 'আমার ছাতা আমি বুঝবো। পাখির খাঁচাটা কোথায় পড়ে রইল, বাইরের বারান্দায়!'

কলকাতার টেলিফোনের মতো, ওপাশ থেকে 'নো রিপ্লাই'।

মধ্যবয়সী ভদ্রলোক ফোলাফোলা মুখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কেমন দিলুম। একে বলে তুরুপের তাস।'

'কে বেশি হারে?'

'সে যদি বলেন, তা হলে আমিই বেশি হারি। আমি ঠিক পারি না মশাই। মহিলা ট্যাক্‌ল করা খুব কঠিন ব্যাপার। মোহনবাগানের মতো অবস্থা হয়। কাটিয়ে কাটিয়ে গোলের

কাছে নিয়ে এলুম। সিওর গোল। মেরে দিলুম গোলপোস্টের বাইরে। অসংখ্য ছেঁদা মশাই। অসংখ্য ছেঁদা।

'ছেঁদা? কিসে ছেঁদা?'

'আমার স্বভাবে। এত ছিদ্র নিয়ে জেতা যায় না। অসম্ভব।'

ভদ্রলোক আর একবার নস্যি নিলেন সশব্দে। তারপর কোণের দিকে হেলে গিয়ে আবার এক রাউন্ড ঘুমের আয়োজন করলেন।

ও মাথা থেকে ভেসে এল নারীকণ্ঠ, 'এবার নেমে পড়লে হয় না। সারা রাত বসে থাকবে না কি?'

আড় হয়ে বসে থাকা ভদ্রলোক চোখ না খুলেই বললেন, 'সাঁতার জল আসেনি।'

ওপাশে দুই মহিলাতে কথা হচ্ছে, একজন আর একজনকে বলছেন, 'ভাই, আমাকে এই জল ঠেলে যেভাবেই হোক যেতে হবে। ছেলেটা এতক্ষণে মা মা করে ঘুমিয়েই পড়ল হয়তো। সারাটা দিন ওই কাজের মেয়েটির কাছে থাকে। মারধোরও করে। এই চাকরি সংসার একসঙ্গে সামলানো যায়।'

'ছেড়ে দে না।'

'ওব্বাবা, চাকরির জোরেই বিয়ে। ছেড়ে দিলেই মারবে লাথি।'

নাঃ, আর না, এবার উঠে পড়ি। যেমন করেই হোক, বাড়ি তো ফিরতে হবে। সব পাখি ঘরে ফেরে। বাসের পাদানিতে ঘোলা নোঙরা জল ছলকাচ্ছে। পাশেই এক বিকল মটোরগাড়ি। পেছনের আসনে মোটাসোটা বদমেজাজী ভদ্রলোক, ক্রমান্বয়ে ঠোঁট নেড়ে চলেছেন। পাশেই এক মহিলা, তিনি পুটুত পুটুত করে মুখের সামনে লেডিজ রুমাল নেড়ে চলেছেন। স্টিয়ারিং-এ অসহায় ড্রাইভার।

ধীরে ধীরে নিজেকে দুই গাড়ির মাঝখানের খালে নামালুম। হাঁটু জল। তলায় ভাঙাচোরা রাস্তা। জল বেশ ঠাণ্ডা। স্পর্শে গা ঘিনঘিন করে উঠল। উপায় নেই। পড়েছি যবনের হাতে। চারপাশে শুধু অচল গাড়ি। সাদা, নীল, লাল, ঘেয়ো, তালিমারা, তাপ্পিমারা, মেহনতী স্টেটবাস। একটা ফুল-সাজ গাড়িতে চন্দনচর্চিত বর। বড়ই উদ্বিগ্ন মুখচ্ছবি। লগ্ন বয়ে

যায়। বরকর্তার ঠোঁটে সিগারেটের আগুন জ্বলছে-নিবছে। উত্তেজনার টানাপোড়েন। গালে জল জল মতো কিসের ছিটে লাগল। ওপরে তাকালুম। ডবলডেকারের দোতলা থেকে থুতু বৃষ্টি হচ্ছে।

এ-গাড়ি সে-গাড়ির মাঝখান দিয়ে নিজেকে রাস্তার বাঁপাশে এনে ফেললুম। ভয়াবহ অঞ্চল জল হাঁটু ছাড়াল। তলায় হড়হড়ে কাদা। অদূরেই ফুটপাথের ধ্বংসাবশেষ। ভাঙা রেলিং। জনগণের ট্রাস্টিরা যতটা পেরেছে খুলে নিয়ে গেছে। সেলিং ন্যাশনাল প্রপার্টি একটা ভালো ব্যবসা। মূলধনের প্রয়োজন নেই। শুধু মেহনত। ফুটপাথের নিরাপত্তায় হাঁটার আশা ছেড়েই দিলুম। নিজের পশ্চাদ্দেশে বারকতক চাপড় মেরে বললুম, বল বীর, বল উন্নত মম শির। তারপর পড়ে যেতে যেতে কোনওরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললুম, ভয়ে ভীত হয়ো না মানব। খোয়ার ঢিবিতে পা পড়েছিল। জলের তলায় রাস্তার ভূগোল পৌরপিতাও জানেন না, আমি তো তাঁর নাবালক সন্তান। বলো, রাখে কেষ্ট মারে কে! বাঁপাশে একটা বড় ঢনঢনিয়া মার্কা বাড়ির তলায় মেহনতী মানুষের জলটায় কল্কে ফাটছে, ব্যোম শঙ্কর। কল্কে একমাত্র জিনিস, যার কৃপায় কাঠফাটা রোদেও মানুষ গান ধরতে পারে—আহা, এমন চাঁদের আলো, মরি যদি সেও ভালো।

কলকাতার বন্দরে বড় বড় জাহাজ ভেড়াবার জন্যে পাইলট দরকার হয়। আমাকে এখন কোন্ পাইলটে নিয়ে যাবে। আমি তো আর কলম্বাস নই, যে ভাসতে ভাসতে আমেরিকা চলে যাব। অথৈ জলে গামলার মতো আমার টালমাটাল অবস্থা। বিশ তিরিশ মিনিটের চেষ্টায় তিন চার কদম এগিয়েছি। একটা ঠং ঠং রিকশা পাকড়াবার চেষ্টা করলুম। পাত্তাই দিলে না। দিলেও সামর্থ্যে হয় তো কুলোত না। কলকাতার রিকশা আর ট্যাকসি খদ্দের চেনে। মাতাল না হলে ওদের নেকনজরে পড়া অসম্ভব।

জয় মা বলে আরও দু দশ পা এগোবার পর মনে হল জলে স্রোতের টান ধরেছে। তার মানে সামনেই খোলা ম্যানহোল। কলকাতার পেটে যাবার সামান্যতম ইচ্ছে নেই। আলকাতরার

মতো অন্ধকার। ছায়ামানবেরা নন্দীভৃঙ্গীর মতো ধূসর প্রেক্ষাপটে নাচছে। কলকাতার রসের গামলায় মানুষ লেডিকিনির টাপুরটুপুর অবস্থা।

একটি বেপরোয়া চরিত্র পাশ দিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'অমন গাগরি ভরণে কে যায় ও চালে চললে রাত ভোর হয়ে যাবে মশাই। এ তো কিছুই নয়, সামনে ফায়ার ব্রিগেড। সেখানে আপনার কর্পানি ডুবে যাবে।' ভদ্রলোক গান গাইতে গাইতে বেরিয়ে গেলেন প্রপেলার লাগানো বোটের মতো। তার সঙ্গে সঙ্গে যাও বা এধারে ওধারে দু-চারটে আলো জ্বলছিল লোডশেডিং-এর ফুঁয়ে সব ধুলো হয়ে গেল। চারপাশ থেকে হো করে বিকট শব্দ উঠল। নিচে ভরা চিত্তরঞ্জন নদী, চারপাশে খাড়া খাড়া বাড়ি, মনে হল নরক থেকে ভয়ঙ্কর একটা সোরগোল উঠে, ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে গমগম করছে।

আমি অসহায়। কি ভেবে জানি না, তিনবার জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ বললুম, বেশ জোরে জোরে। সঙ্গে সঙ্গে একেবারে পেছন থেকে কে একজন জড়ানো গলায় বললেন, 'কমরেড, বিপ্লব শুরু হল না শেষ হল?'

একেবারে কাঁধের পাশে। নাকে ভক করে মালের গন্ধ লাগল।

মালুদা হঠাৎ শাসনের গলায় বললেন, 'হেডলাইট, ব্যাকলাইট ছাড়াই বেরিয়ে পড়েছ বাওয়া। তা থামলে কেন সোনার চাঁদ! পাম্পে গিয়ে আমার মতো পেট্রল নিয়ে এসো। ট্যাঙ্কে মাল নেই বাওয়া মুফতে মাইল মারবে! মামার বাড়ি! ভাগনে! এটা মামার বাড়ি!'

মাতাল আর দাঁতাল দুটোই ভীতিপ্রদ। আমার স্পিড সামান্য বাড়ল। মাতাল তবু সঙ্গ ছাড়ে না। প্রায় পাশে পাশে ঘাড়ে ঘাড়ে। মন্দ কি। সামনে সামনে চলুক না। গাড্ডায় পড়লে সাবধান হওয়া যাবে। ওব্বাবা, জাতে মাতাল কিন্তু তালে ঠিক। আমি মন্থর হলে তিনি থেমে পড়েন। আবার হেঁড়ে গলায় গান ধরেছেন, 'নাই বা ঘুমালে প্রিয় রজনী এখনও বাকি।'

ফায়ার ব্রিগেডের কাছাকাছি এসে গানের বাণী পাল্টে গেল, 'আমার যেমন বেণী তেমনি রবে পেণ্ডুলাম ভেজাবো না।' কি

মানে কে জানে! খপ করে আমার হাত চেপে ধরলেন, 'কমরেড আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'আপনি কোথায় যাচ্ছেন জানি না, আমি বাড়ি যাবার চেষ্টা করছি।'

'আমি তা হলে কোথায় যাচ্ছি! রসাতলে। আমি কে? বলতে পার আমি কে!'

'আপনি অবতার।'

'ধুস, আমি শ্যামার বর। তুমি কমরেড কার বর?'

'নীপার বর।'

'তুমিও বর আমিও বর। মাইন্ড ইট বরযাত্রী নই। তোমার পেট খালি?'

'একেবারে খালি।'

'স্টপ। স্টপ। আর এক পা এগিও না। ডুবে যাবে। পেটে মাল নেই, কি সাহস! সমুদ্র পার হবে!'

'আমার বউমাকে বিধবা করবে! নিষ্ঠুর। তুমি কি নিষ্ঠুর!'

ভদ্রলোক হাপুস হুপুস করে কাঁদতে লাগলেন। পরনে দামী জামাপ্যান্ট। গায়ে বিলিতি সেন্টের গন্ধ। আর আমার দরকার নেই, খুব হয়েছে। জল প্রায় কৌপিন স্পর্শ করেছে। আমি মরীয়া হয়ে সামনে এগোচ্ছি। মেছোবাজারের খালি ফলের টুকরি দুলতে দুলতে ভাসছে। আকাশ আবার ঘোর হয়ে এসেছে। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা নামল বলে। লম্বা একটা বাঁশ উঁচু হয়ে আছে। ম্যানহোল সঙ্কেত। দূরে একটা বাড়ির সর্বাঙ্গে আলোর ঝালর ঝুলছে। তার মানে ও তল্লাটে লোডশেডিং হয়নি। বিয়ে-বাড়ি। লোকজনের কালো কালো মাথা নাড়ছে। গাড়ির গুঁতোগুঁতি। চিৎকার চেঁচামেচি। সিনেমা ভেঙেছে। ঠোঁটে ঠোঁটে হিন্দি গানের কলি। ওই অন্ধকারেই কে একজন সুরেলা গলায় গেয়ে উঠল, 'গিলে লে গিলে লে, আরো আরো গিলে লে।' আর কি গিলবে বাবা, সারা কলকাতাটাই তো গিলে ফেলেছে। ডানপাশে পাতল রেলের সাজসরঞ্জাম। যেন ময়দানবের কারখানা। হলদে শাড়ি পরা স্বাস্থ্যবতী একটি মেয়েকে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে এক কাপ্তেন বলছে, 'ওর ভেতর জাপানী আছে। এপাশ

থেকে ফুটো করতে করতে ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে যাবে।' মেয়েটি অমনি বায়না ধরল, 'আমি জাপানী দেখব। ও হুলোদা, আমি জাপানী দেখব।'

ছেলেটি বললে, 'বাড়ি চল। তোর মা তা না হলে জাপানী দেখবে।'

অন্ধকার সমুদ্র থেকে ভেসে এল মাতালের কণ্ঠস্বর—'নীপার বর, কোথায় পালালে বাবা! শ্বশুরবাড়ির পাড়া যে এসে গেল।'

মালের ট্যাঙ্ক আর প্যাটন ট্যাঙ্ক দুই অপ্রতিরোধ্য। মাতাল ঠিক চলে এসেছে। বাঁপাশে লাল আলোর এলাকা। এদিকে তেমন জল নেই। সব নেমে গেছে পাতাল রেলের গর্তে। অন্ধকারে বিশাল এক চেহারা যেন পাতাল ফুঁড়ে উঠল, 'লাগবে না কি স্যার, তেরো থেকে তেত্রিশ?' কোনওরকমে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এলুম। ফ্রক পরা তের চোদ্দ বছরের একটা মেয়ে ধুপটি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে লম্বা একটা সিগারেটে পাকা টান লাগাচ্ছে। আগুন বড় হচ্ছে, ছোট হচ্ছে।

অন্ধকারে আবার আর্তনাদ—'নীপার বর, কোথায় গেলে বাওয়া!'

পাড়ায় এসে ঢুকলুম। আলো আছে। ঢোকার মুখেই ছাইগাদা। বৃষ্টিতে ধোলাই হয়ে পরিচ্ছন্ন কয়লার সুন্দর কৃষ্ণ চাউনি। ঝড়ে আর জলে মোড়ের মাথার কৃষ্ণচূড়া গাছের পাতার অলঙ্কার ছিন্নভিন্ন হয়ে ভিজে পথে ছড়িয়ে আছে। একটু আগেই এ পাড়ার কেউ হয়তো চিরবিদায় নিয়েছেন। সাদাফুলের পাপড়ি আর খই পড়ে আছে।

বিশু ময়রার দোকানে গরম রসগোল্লা রসে ফুটছে। বেঁচে অখণ্ড অবস্থায় ফিরেছি। পুরোটাই আমার কৃতিত্ব। বিদ্যুৎ-স্পৃষ্ট হতে পারতুম। গর্তে সমাধি হতে পারত। নিশাচরে নাঙ্গাবাবা করে দিতে পারত। প্রায় পুনর্জন্ম। হোক শেষ মাস। দশ টাকার গরম গোল্লা কিনে ফেললুম। আর এক খদ্দের বললেন—'আজ আড়াই ইঞ্চি বৃষ্টি হয়েছে।'

বিশু বললে—'আপনার বালতিতে ছেঁদা ছিল! ওই দেখুন

আমার ছ'লিটার বালতি বাইরে বসানো আছে। ভরে উপচে পড়েছে।'

জলে ভিজে প্যাণ্ট ব্রিচেস। পা জলে চুপসে চামচিকে। হাতে গরম রসগোল্লা। একবার কড়া নাড়লুম। কেউ বললে না 'যাই'। উপন্যাসের বিরহিনী নায়িকার মতো কপালে সজল টিপ পরে, ঘরে প্রদীপ জেবলে গবাক্ষে কেউ প্রতীক্ষায় নেই। জানলার যে অংশের জোড় বার্ধক্যে ফাঁক হয়ে গেছে, সেই চিলতেতে জোরালো নীল আলোর নাচানাচি। টি. ভিতে সাংঘাতিক কোনও বিজ্ঞাপন অনুষ্ঠান চলেছে। দুয়ারে নীপার বর কেঁপে মরছে।

আবার কড়া। ভেতর থেকে প্রলম্বিত প্রশ্ন—'কে এ এ!'

আশ্চর্য! এখন আমি ছাড়া আর কে আসবে! আমি যে আসতে পারি, এ বোধটাই নেই। হায় সংসার! না ধরেই নিয়েছে, গরু যখন হোক গোয়ালে ফিরবে। গম্ভীর গলায় বললুম, 'আমি।'

ভেতর থেকে আদুরে এলানো উত্তর—'যাই'। টি ভিতে এক-গাদা দামড়া ভাঁড়ামো করছে।

খুট করে দরজা খুলে গেল। বউ নয় শালী। কখন এসেছে কে জানে! ভেতর থেকে বোনের প্রশ্ন—'কে রে? ও!'

আমি আমার বউয়ের পায়ের পাতা দেখতে পাচ্ছি। জোড়া হয়ে আছে। টি. ভির পর্দার আধখানা। সেই অর্ধাংশে এক দেহাতী মহিলা হাঁউ হাঁউ করছে। নীপা আধশোয়া হয়ে টি. ভি দেখছিল। উঠে এল রাজহংসীর মতো। যেন ডিমে তা দিচ্ছিল। সোনার ডিমে।

'কি গো এত দেরি হল?'

প্রশ্ন শুনে গা জবলে গেল। শালীকে সাক্ষী রেখে কড়া কথা চলবে না। দাঁতে দাঁত চেপে প্রশ্ন—'তোমাদের এদিকে বৃষ্টি হয়নি?'

'একটু হয়েছে। অ, তাই বুঝি তুমি ভিজে গেছ!'

আমি ঢোকার জন্যে পা তুলেছি, নীপা হাঁ হাঁ করে উঠল—'ঢুকো না, ঢুকো না রাস্তার জল, রাস্তার জল! ওই এক পা তোলা অবস্থায়, আমি সেই বিখ্যাত হিন্দিগানের রূপান্তরিত

কলি—'তোরি দ্বয়ার খাড়া এক যোগী [যোগী নয় বক]। নীপার
বক।

আর সেই অবস্থাতেই দেখলাম—একটু আগে মৌজ করে সব চিঁড়ে ভাজা খেয়েছে। খালি কফির কাপ। ফুলকাটা ডিশে লাল একটা ভাজা লঙ্কা। আর টি· ভি গাইছে—ইয়ে হ্যায় জিন্দেগী।

———

স্বাগত সাতাশি

সুপ্রভাত সাতাশি। গুড মর্নিং। তার আগে দিশী কোম্পানীর এক চাক্‌লা কেক খেয়ে নি। পিঠেপুলি তো আর তেমন ধাতে সয় না। বাঙালি প্রথায় একমাত্র মালপো ছাড়া সবই অখাদ্য। চালের গুঁড়োর খোলসের ভেতর গুড় দিয়ে চটকানো নারকেলের পুর ঠেসে, তারপর হয় জলে, না হয় দুধে সিদ্ধ করে, ছুঁচোর মত দেখতে কী একটা তৈরি করা নয়! অপূর্ব! অনবদ্য! ওই বস্তুটিই মনে হয় গীতার আত্মপুরুষ, যাকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, নৈনং ছিন্দান্তি শস্ত্রানি, নৈনং দগ্ধতি পাবক। দাঁতে ফেললেই বোঝা যায়, সহজে কাবু হওয়ার জিনিস নয়। কাবু করার জিনিস। 'যতবার আলো জ্বালাতে চাই'-এর মতো, যতবার দাঁত বসাতে যাই, নিবে যায় বারে বারের মতো, ফিরে আসে বারেবারে। ছেলেবেলায় ইরেজার খাবার অভিজ্ঞতা। এর নাম পিঠে। পুলি পিঠে না সিদ্ধ পিঠে, কী যেন বলে! এই পিঠে পেটের জিনিস নয় পিঠের জিনিস। সাউথ আফ্রিকা, জাপান, প্রভৃতি দেশে জনতা ছত্রভঙ্গ করার জন্যে রাবার বুলেট বন্দুকে পুরে ছোঁড়া হয়। আমাদের দেশেও গুলি না চালিয়ে পুলিপিঠে চালানো যায়। দমাদ্দম পিঠে চালিয়ে রাজভবন কি এসপ্ল্যানেড ইস্ট থেকে জনতা ছত্রভঙ্গ করলে, জনগণেরও কিছু বলার থাকবে না। প্রবাদেই আছে পেটে খেলে পিঠে সয়। অনেকটা হরির-লুটের মতো।

আমাদের ভাষায় যেমন বাংলা আর ইংরেজির পাঞ্চ, সেই রকম সংস্কৃতিতেও বাঙালি, বিহারি, ইংরেজি, পাঞ্জাবি, ফরাসি, ফারসি, তুর্কি, মুর্কি, যা পেরেছি, সব ঢুকিয়ে মানিকপীরের মতো এক আলখাল্লা তৈরি হয়েছে। সাতাশিকে তাই সুপ্রভাত বললে হবে না, গুড মর্নিং, রাম রাম, সালাম আলেকুম সবই বলতে হবে। কেক, পিঠে, সরুচাকলি, চরণামৃত, বোতলামৃত সব দিয়েই ভজনা করতে হবে।

পিঠে আর পেটো যেমন প্রায় এক হয়ে এসেছে, মালমশলা আর শিল্প নৈপুণ্যে, সেই রকম হয়েছে কেকের অবস্থা। কেক আর ডাংকেক প্রায় সমান। আগে যে চাল ছিল, সে চাল আর নেই। বাসমতীই আছে তবে মুখে তোলার আগে দম বন্ধ করে তোলাই ভালো। আর মুখে পুরে ফোঁস না করাটাই নিরাপদ, কারণ তাহলেই মনে হবে ধাপায় ডাইনিং টেবিল পেতে লাঞ্চ করছি। এক বড় কর্তাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, 'মশাই, ভাত আর ভাল্লুক, একই রকম গন্ধ হল কী করে! কোন কায়দায়? ভাল্লুক বলায় তিনি ভেবেছিলেন আমি বিয়ারের সঙ্গে তুলনা করছি। বললুম, বোতলজাত ভাল্লুক নয়, সেই ভাল্লুক, যা কলকাতার রাস্তায় খেলা দেখায়। তিনি বললেন, 'কী জানি মশাই! আমার সাইনাস আছে। সারা বছরই নাক বুজে থাকে।

যাঁরা প্রবীণ তাঁর অতীতের স্বর্ণময় দিনের স্মৃতি রোমন্থন করেন। এক আনায় ষোলটা হিঙের কচুরি। দু পয়সার মটকির ঘি কিনলে জয়েণ্ট ফ্যামিলির সবাই পেট ভরে ফুলকো লুচি খেতে পারতেন। এক পয়সায় দু হাত মাপের জ্যান্ত রুই। সেই প্রবীণরাই আক্ষেপ করেন, 'আর পিঠে! সেই পিঠে! আমার পিসিমা করতেন। সে কী ফ্লেভার! দুধ আর নলের গুড়ে ফুটছে, মনে হচ্ছে বাস্তু বেরিয়েছে।'

'বাস্তু বেরিয়েছে মানে?'

'হা ভগবান! বাস্তু জান না! বাস্তু হল বাস্তু সাপ। বাস্তু সাপ। বাস্তু সাপের অপূর্ব সুগন্ধ।' শহরে আর সাপ কোথায়। ক'জনেরই বা বাস্তুভিটে আছে! আমরা যে সাপ চিনি, তা বেরোয় মানুষের মনের গর্ত থেকে! গন্ধ নেই, ছোবল আছে। তা সেকালের পিঠেতে না কি, চাল আর গুড়ের গুণে মিঠে মিঠে, সোঁদা সোঁদা অদ্ভুত এক গন্ধ বেরতো। একালের চাল তো আর বস্তায় থাকে না, থাকে মানুষের চলনে। সমাজে চালিয়াত চন্দরের অভাব নেই। কেক হল পিঠের মেড-ইজি। চাল গুঁড়নোর হাঙ্গামা নেই। নারকেল কোরার ঝামেলা নেই। দোকানে দোকানে রঙিন সেলোফেন মোড়া পিঠ উলটে পড়ে আছে বিলিতি পিঠে।

টোপর ছাড়া বিয়ে হয় না। কেক ছাড়া আজকাল নববর্ষ হয় না। ইংরেজি নববর্ষ। যাকে প্রকৃত কেক বলে, তা তৈরি হয় বড় নামী জায়গায়। দামও সাংঘাতিক। এক টুকরো খাবার পর এক ঘণ্টা ধ্যানস্থ। বিবেকের সর্পদংশন। পাঁচ দশ টাকা ভুস্ হয়ে গেল। আড়াই টাকা দাঁতের খাঁজেই লেগে রইল। আগে ডেন্টিস্টের কাছে গিয়ে দাঁত ফিল করিয়ে দুঃসাহস দেখানো উচিত ছিল। হ্যাপি নিউ ইয়ার করতে গিয়ে সারা মাস ডালভাত। প্রায় মল-মাসের মতো অবস্থা।

টুনি-জ্বলা পাড়ার দোকানে যে মাল 'অ এ অজগর' হয়ে আছে তার দশা ওই পিঠের মতো। আটা চটকানো চিনির ড্যালা। কুমড়োর বরফি যেন কাঁচ বসানো খাদির ওড়না। পাঁউরুটির মিষ্টি সংস্করণ। দাঁতে জড়িয়ে যায়। বাটালি দিয়ে দাঁত চাঁছতে হয়। টুথ ব্রাশের কর্ম নয়। পেটে ঢুকে হামাগুড়ি দেয়। চা পড়া মাত্রই অম্বল। নিউ ইয়ার টকে যায়। অ্যান্টাসিড দিয়ে সামলাতে হয়।

শুরু যদি এই হয়, শেষে কী হবে জানা আছে। কত বছরই তো এইভাবে এল আর গেল। না বাড়ল ধন-সম্পদ, না বাড়ল মান-সম্মান। বাড়ার মধ্যে বাড়ল কেবল বয়স। যুবক থেকে প্রৌঢ়, প্রৌঢ় থেকে বৃদ্ধ। দশ বছর আগে সাইকেল চালক বলত, 'দাদা সরে, দাদা সরে', এখন বলে, 'দাদু সরে, দাদু সরে। আগে আমি গুঁতিয়ে বাসে উঠতুম, এখন আমি গুঁতো খেয়ে ছিটকে পড়ি। বছর আসে বছর যায়, বুঝতে পারি ভালোবাসা কমছে। বছর আছে, ক্যালেণ্ডার আছে, প্রেম, নেই।

ছিয়াশির পয়লা কী হয়েছিল মনে আছে! আমার জন্যে এক করো কেক কেটে ডিশে ফেলে রেখেছিল। ইংরেজিতে যাকে লে, 'ইন গুড ফেথ'-সেই পূর্ণ আস্থা নিয়ে মুখে ফেলে দিলুম। জভ পরোটা। কে জানতো পিঁপড়েরাও নববর্ষ করে! হাজার নেক লাল পিঁপড়ে জড়িয়ে ছিল। মুখে ফেলার সময় এক হমার দেখায় ভেবেছিলুম কারিকুরি। পোস্তর দানা খিয়েছে। প্রথমে জিভটাকে কামড়ে শেষ করে দিলে। একটা হিনী টনসিল আক্রমণ করে গলায় বড়ে গোলাম আলির

জোয়ারি এনে দিল। বাকি সব স্টম্যাকে ঢুকে সেলাইকল চালাতে লাগল। ডি.ভি.সি.র জল ছাড়ার কায়দায় গলার স্লুইস গেট খুলে কয়েক গ্যালন চালিয়ে দিলুম। নে সব ডুবে মর। গেরস্তের সে কী হাসি! সবাই বললে, সাঁতার শিখে নে।

সাঁতার তো শেখাবে। কোন সাঁতার। সংসার সমুদ্রে সাঁতার কাটা শেখাবে কী! সেই সাঁতারই আসল সাঁতার। এত চেষ্টা করেও যা শেখা গেল না। টাকার লাইফবোটে চেপে সমুদ্র পাড়ি দেওয়া যায়, সেই টাকাই তো নেই। এখন একটা ষাঁড় খুঁজছি, যার ন্যাজ ধরে বৈতরণীটা অন্তত পার হওয়া যায়! সেটা তো পেরতে হবে! সাতাশি তো সেই কথাই স্মরণ করাতে চায়। জীবনে তো বালির ঘড়ি। ঝুরঝুর করে ঝরেই চলেছে। এ ঘড়ি গোল হয়ে ঘোরে না। বারোটা একটা নেই। সোজা ছুটছে। মানুষের সঞ্চয় কমে এলে ভয় হয়। পুঁজি তো আর বেশি নেই। চেক-বই শেষ হয়ে আসছে। এরপর হঠাৎ একদিন সেই লাল স্লিপটা বেরিয়ে পড়বে। সতর্কবাণী, আর মাত্র পাঁচটা আছে। জীবনের বছর এমন ব্যাঙ্কে জমা আছে, যে ব্যাংক দ্বিতীয় বার আর চেক বই দেয় না।

ইংরেজিতে বলে, লুক বিফোর ইউ লিপ। ঝাঁপাবার আগে দেখে ঝাঁপাও। বছর এমন এক নদী, সেখানে না দেখেই ঝাঁপাতে গিয়ে ছেলেবেলায় নদীতে প্রথম সাঁতার শেখার কথা মনে পড়ছে। হাফ প্যান্ট পরে কোমরে গামছা বেঁধে দাঁড়িয়ে আছি ঘাটে, হঠাৎ আচমকা ধাক্কা মেরে জলে ফেলে দিলেন আমার সাঁতার শিক্ষক। হাবুডুবু। বোয়াল মাছের মতো গ্লাব গ্লাব করে জল খাচ্ছি। একবার ডুবছি, একবার উঠছি। বেঁচে থাকার কী অদম্য ইচ্ছা! যিনি আমাকে হঠাৎ ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিলেন, তিনিই আবার চুলের ঝুঁটি ধরে ভাসিয়ে দিলেন। সেই যে ভাসতে শিখলুম জলে, আর ডুবিনি কোনও দিন। সেদিন প্রচণ্ড অভিমানে কেঁদে ফেলেছিলুম। আমার সাঁতার শিক্ষক কাকাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, 'কেন আপনি আমাকে অমন করে ঠেলে ফেলে দিলেন?' তিনি বলেছিলেন, 'বোকা। জল না খেলে সাঁতার শিখবি কী করে!'

পুরনো বছর আমার সেই সাঁতার শিক্ষক, আচমকা ধাক্কা মেরে নতুন বছরের স্রোতে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায়। জলে পড়লে হাত-পা তো ছুঁড়তেই হবে। উপায় নেই। ছিয়াশির মতো সাতাশিতেও হাত-পা ছুঁড়ব। শীত শীত ভাব কেটে গিয়ে আসবে ক্ষণবসন্ত। কোথাও না কোথাও একটা কোকিল ডাকবেই। এসে যাবে গ্রীষ্ম। গদিতে যাঁরা গদিয়ান, তাঁরা প্রথমে চিৎকার করবেন, খরা, খরা বলে। তারপরই আসবে বন্যা। শুরু হয়ে যাবে বন্যাত্রাণের নাচা-গানা। কলকাতার পুকুর পানিতে নাকানি-চোবানি খেতে খেতে আমাদের দাদ, হ্যায়জা, খুজ্‌লি হয়ে যাবে। এক্সপার্ট তাঁর মাচা থেকে ওপিনিয়ান ছাড়বেন, কলকাতা হল বাটি, এ বাটিতে জল জমবেই। কুইন ভিক্‌টোরিয়া কি জর্জ দি ফিফ্‌থের সঙ্গে ওপরে গিয়ে দেখা হলে বোলো, 'কী প্ল্যান করেছিলেন মশাই! ভূগর্ভের নকশাটা আমরা হারিয়ে ফেলেছি ম্যাডাম। একটা কপি দিতে পারো! স্বপ্নে প্রশান্ত শূরকে জানিয়ে দাও।'

স্বাগত সাতাশি। যা হওয়ার তা হবে। যা হওয়ার নয়, তা হবে না। এই তো জেনেছি। ময়দানে ফুটবল পড়বে। হয় মোহনবাগান, না হয় ইস্টবেঙ্গল জিতবে। নতুন নতুন ছেলে-মেয়েরা নতুন নতুন প্রেমে পড়বে। কিছু কর্মচারী রিটায়ার করবেন, নতুন কিছু চাকরি পাবেন। পাত্রপাত্রীর কলামে বিজ্ঞাপন হাতড়াবেন ছেলে-মেয়ের বাপ। সানাই বাজবে আবার বল হরি-ও হবে। প্রতিবেশীর সঙ্গে হাতাহাতি হবে। কারুর সঙ্গে হলায়-গলায় হবে। কর্তার মেজাজ কখন চড়বে, কখনও নামবে। গৃহিণী কখনও সরাসরি কথা বললেন, কখনও দেয়ালে ক্যামেরার আলোর কায়দায় বাউন্‌স করিয়ে। সার সত্য-চলছে চলবে। টাকেও চিরদিন চলবে।

———

মানভঞ্জন পালা

কথায় আছে, ব্যাচেলার বাঁচে প্রিন্সের মতো, আর মরে কুকুরের মতো। এই নীতি বাক্যটির রচয়িতা মনে হয় কোনও মেয়ের পিতা। কে কি ভাবে মরবে বলা শক্ত। বিয়ে করলেই যে সুখের মৃত্যু হবে, এমন কথা কি হলফ করে বলা যায়! মৃত্যুর সময় স্ত্রী মাথার কাছে বসে থাকবেন এক চামচ গঙ্গাজল হাতে, এমন আশা এই নারী প্রগ্রতির যুগে না করাই ভালো। আমাদের লৌকিক বিশ্বাসে এমন ধারণাও প্রচলিত আছে, পুত্র মুখাগ্নি না করলে আত্মার উদ্ধার নেই। আবার অপুত্রবতীকে গ্রাম্য ভাষায় যে শব্দে সম্বোধন করা হয় তা একপ্রকার গালাগালি। এমন রমণীর মুখ-দর্শনে দিন ভালো যায় না।

আমাদের সমাজ আসলে বিবাহের স্বপক্ষে, আর সেটাই স্বাভাবিক। সন্ন্যাসী হয়ে সংসার ত্যাগ করা এক কথা। আর আইবুড়ো কার্তিক হয়ে সারাজীবন মজা মেরে বেড়ানোটা দোষের। প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ শাস্ত্র সমর্থন করে না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নবাগত ভক্তকে নানা খোঁজখবর নিতে নিতে প্রশ্ন করতেন, বিয়ে করেচো? ভক্তটি যদি বলত, হ্যাঁ, বিয়ে করেচি, ঠাকুর অমনি হৃদয়ের দিকে তাকিয়ে বলতেন, যাঃ, বিয়ে করে ফেলেছে রে! যেন বিয়ে করে ফেলাটা মহা অপরাধ। প্রথম পরিচয়ের পর স্বয়ং কথামৃতকার শ্রীমকেও ঠিক এই কথাই শুনতে হয়েছিল। তিনি খুব হতাশ হয়েছিলেন এই ভেবে যে, জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেল। যে উদ্দেশ্যে মহাপুরুষের কাছে আসা, সেই উদ্দেশ্যসাধনের একমাত্র বাধা বিবাহ। ঠাকুরের অনেক বিবাহিত ভক্ত ছিলেন। তাঁদের একেবারে হতাশ না করে একটা মধ্যপথের সন্ধান দিয়ে-ছিলেন। কামজয়ী হওয়া বড় কঠিন। প্রকৃতি ঘাড় ধরে তাঁর কাজ করিয়ে নেবেন। কামিনী, কাঞ্চন বড় সাংঘাতিক আকর্ষণ। সাধুকেও বারে বারে বলতে হয়—ওরে সাধু সাবধান। যত

ভক্তিমতী মহিলা হোক, সাধুর উচিত শত হস্ত দূরে থাকা। নির্জনে ধর্মালাপও পদস্খলনের কারণ হতে পারে। নারীর চিত্রপট দর্শনেও মতিভ্রম হওয়া অসম্ভব নয়। গৃহী সম্পর্কে ঠাকুরকে সামান্য নরম হতে হয়েছিল। দুর্গে বসেই লড়াই করা ভালো। মন যখন আর কিছুতেই বশ মানছে না, তখন না হয় ওই সদারা সহবাসই হল। শ্রীরামকৃষ্ণ আবার স্ত্রীর দুটি শ্রেণী করেছিলেন। বিদ্যা আর অবিদ্যা। বিদ্যা স্ত্রী সর্বদা স্বামীর উন্নতির সহায় হন। স্বামীর সাধনসঙ্গী হন। যে ধারায় নারী নিয়ে সাধনার প্রথা প্রচলিত, সেই ধারাকে ঠাকুর বলতেন বড় বিপজ্জনক। যে কোনও মুহূর্তে সাধকের পতন হতে পারে।

এ কালে সাধন-ভজনের কথা কে আর ভাবে! যুগ বদলে গেছে। মানুষের আকাঙ্ক্ষার ধরনধারণ অন্যরকম হয়ে গেছে। মানুষ এখন বিষয়-আশয় ছাড়া অন্য কিছু তেমন আমলে আনে না। জীবনের বৃত্ত তৈরি হয়েছিল, সেই বৃত্তে বংশগতির ধারা অনুসরণ করে, চালাও পানসি বেলঘরিয়া, খাটে শুয়ে ঘাটে চলে যাও। ছবি হয়ে ঝুলে পড় দেয়ালে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যাম্প, ইণ্টারভিউ, ধরাকরা, চাকরি, বছর না ঘুরতেই পেছন উল্টে, পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপনে চোখ বোলানো, চিঠি চালাচালি, মেয়ে দেখা, দেনাপাওনার ধস্তাধস্তি, কভরি সোনা, সানাই, সাতপাক সংসার। আজকাল আবার বিয়ে করেই বিদেশে দৌড়তে হয়। বিলিতি কায়দা। হনিমুনের ভারতীয় সংস্করণ। কতটা মধু আর কি চাঁদ, সব বোঝা যাবে শেষ দেখে। ওই জন্যে বাঙলা প্রবাদই আছে—সব ভালো যার শেষ ভালো।

এ কালে দাম্পত্য জীবনের নিয়ামক হল অর্থনীতি। ধর্ম নয়, ষড়দর্শন নয়, উচ্চমার্গের আহ্বান নয়। একটিই বাণী, হাম দো, হামারা দো। নির্বিচারে বেড়ো না, ফ্ল্যাটে ধরবে না। ছেলের বাপ, বাপের বাপ কি ভাবে মানুষ হয়েছিলেন, আর এ কালের নয়া জমানার হিরোদের কি ভাবে মানুষ করতে হয়! পাড়ার ইস্কুলে পড়া হয় না। ধরনা দিতে হবে সেণ্ট অথবা হোলি লাগানো ইস্কুলে। পাঁচুবাবু পাড়ার বিন্ধ্যবাসিনী বিদ্যালয়ের পাঁচ সিকে মাইনে দিয়ে পড়ে রেল কম্পানির ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার

হয়ে রিটায়ার করেছিলেন, আর একালের অগ্নিভ বা অয়স্কান্ত মাসে শ আড়াই হজম করেও দশটা ফিগার টোটাল দিতে সোলার ব্যাটারি লাগানো পকেট কম্পিউটার খোঁজে। আর ইংরিজি এখন ন্যাজ খসা টিকটিকি, হাফ আছে হাফ নেই, ফাণ্ডা, ক্যালি, ফ্যানিন'র ছড়াছড়ি। রাইটিং-এ একটা টি না দুটো টি, বেগি-এ একটা জি না দুটো জি, হালার ইংরিজি। বাঙলা বানানের কোনও মা-বাপ নেই। ফলে ই, ঈ, উ, ঊ, শ, ষ, স, সব একাকার। বাঙলার পিতা যে সংস্কৃত, সেই সংস্কৃত এখন কুলাঙ্গার পুত্রের দশ দশা দেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কার কমিটিতে নাম লিখিয়েছেন। যাঃ, সব এক করে দিলুম। একটা ই, একটা উ, একটা শ। গায়েও 'পাঞ্জাবি', পথেও 'পাঞ্জাবি'। বিধান সরণি লিখতে গিয়ে মনে হয়, রাস্তাঘাটের ইংরেজি নামই ভাল ছিল। দন্ত্যস না তালব্য। দন্ত্যন না মূর্ধন্য ণ। ই না ঈ। 'পীড়াপীড়ি'র ঝামেলায় কোথাও 'পেড়াপেড়ি'-তেও একই কাজ। এখন বেশিরভাগ শাশুড়ীই জামাই বাবাজীবনের কৃপায় 'ব'ফলা যুক্ত। গোঁফ থাকলে শ্বশুর না থাকলেই শ্বাশুড়ী।

আজকাল আবার এমন অমানবিক ঘটনা ঘটছে, পরিবার ছোট রাখতে গিয়ে গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট করিয়ে আসছেন সুপার-শিক্ষিত-মানুষ! এ না-কি নরহত্যা নয়! পরিবার পরিকল্পনা। সে কালের মানুষ বীর ছিল কত! বিয়ে করেছি। সংসার বাড়বে। কুছ্‌ পরোয়া নেই। খেঁদি আসবে, পটলা আসবে, পটলি আসবে, পাঁচি আসবে। সো হোয়াট! জিভ দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি। ডাল-ভাত, শাক-ভাত খেয়ে ঠিক মানুষ হয়ে উঠবে। ডিম, টোস্ট, ছানা, কলার প্রয়োজন নেই। একালের এই ছোট পরিবার, তুমি আমার আর আমি তোমাদের কালে, ছেলেমেয়েরা হয়ে উঠছে একলাষেঁড়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী। ছেলেবেলা থেকেই যারা শিখছে কেরিয়ার ছাড়া কিছু নেই। হিউম্যানিস্টের বদলে কেরিয়ারিস্ট।

এই চলতে থাকলে যা হবে, তা হল, আকাশের উঁচুতে পায়রার খুপরি। হোমিওপ্যাথিক ফ্যামিলি। অ্যালোপ্যাথিক ফ্যামিলি প্ল্যানিং। মনের খোরাক মেলামেশা নয়। টি ভি. পপ ম্যাগাজিন,

পপ সং। প্রগতি আরও এগোলে এই হবে, স্বামীকে বা স্ত্রীকে সহ্য না হলে মামলা, বিচ্ছেদ, পুনর্বিবাহ। তুমি কার কে তোমার! বৃদ্ধের স্থান পথে, পার্কে। বৃদ্ধার স্থান দেবালয়ে। মৃত্যুর পর চটজলদি বৈদ্যুতিক চুল্লিতে দাহ। আর ব্রাহ্মণকে মূল্য ধরে দিয়ে মাথার ঝুমকো চুল বাঁচানো। ঝুমকা গিরারে।

মানুষ বাঁচে মৃত্যুর পর কারুর না কারুর দু ফোঁটা চোখের জলের আশায়। এই চাতক সভ্যতায় জল কোথায়! সাগর শুকালো, মেঘ লুকালো। ছাই রঙের আকাশে শুধুই পলিউশান। চোখে বালি না পড়লে চোখের জল আর পড়বে না। সব রাগপ্রধান সংসারেই, একটি পালা, স্ত্রীর মানভঞ্জন পালা।

———

মইয়ের বদলে বই

বাঘ যেমন মানুষ দেখলে খেপে যায়, যাঁরা বইয়ের নেশায় পড়েছেন, তাঁরা সেই রকম বই দেখলে নিজেকে আর সংযত রাখতে পারেন না, হামলে পড়েন। ছেলের লেখা-পড়া, মেয়ের বিয়ে, বউয়ের অপারেশন, সব মাথায় উঠে যায়। বইয়ের এমন আকর্ষণ! মনে পড়ে প্রথম যখন অক্ষর পরিচয় হল, সে কি আনন্দ! অ-এ অজগর আসছে তেড়ে। বানান করে করে যখন পড়তে শিখলুম, তখন মনে হল চারপাশ বন্ধ ঘরের জানলা খুলে গেল! এখন ভাবি পড়তে না শিখলে কি হত! মন জলাশয় পচে, দুর্গন্ধ হয়ে, জীবনেই মৃত করে দিত। এখনও মনে আছে ঈশপস ফেবলসের কথা। আমাদের ক্লাস সেভেনের পাঠ্য ছিল। জানুয়ারীর এক শীতের রাতে, অন্যান্য পাঠ্য পুস্তকের সঙ্গে আমার বাবা ওই বইটি কিনে আনলেন। প্রকাশক, ম্যাকমিলন। চকচকে পাতা, গোটা গোটা কালো অক্ষর, পাতায় পাতায় রঙীন ছবি। ঝুঁকে পড়ে, শুয়ে, বসে, নানাভাবে দেখেও আশ আর মেটে না। হি হি করছে শীত। ঘরের ঠাণ্ডা লাল মেঝে যেন কামড়াতে আসছে। কোনও দৃকপাত নেই। আমি দেখছি সেই বুদ্ধিমান কাককে। ঠোঁটে করে পাথর তুলে তুলে কলসীর মধ্যে ফেলছে। দেখছি সেই ধূর্ত শৃগালকে! দ্রাক্ষা ফল অতিশয় টক বলে যে সরে পড়ছে। প্রথম দিনের প্রথম দেখা সেই ফেবলসের স্মৃতি আজও লেগে আছে মনে। এখন তো স্কুল থেকে ইংরেজি বিদায় নিয়েছে। থাকলেও বই-পত্র বদলে গেছে। ফেবলস আর পড়ানো হয় না। একালের পাঠ্যপুস্তক মানেই রদ্দি কাগজ, নিকৃষ্ট বাঁধাই, ভাঙা টাইপ, লাইনে লাইনে ছাপার ভুল।

আর একটু উঁচু ক্লাসে আর একটি বইও মনে গেঁথে আছে, ডিকেনসের ডেভিড কপারফিল্ড। অকসফোর্ডের বই। কোনও চাকচিক্য নেই, কিন্তু সুন্দর ইংরেজি, অপূর্ব কাহিনী। ভালো-

মন্দ অসংখ্য চরিত্র। একটি কিশোরের জীবন কাহিনী। উই আর রাফ বাট রেডি উক্তিটি আজও ভুলিনি। আমার সহপাঠী কেষ্ট অসাধারণ ছবি আঁকতে পারত। আমাদের স্কুলটা ছিল একেবারে গঙ্গার ধারে। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে। গঙ্গার ধারে একটা সুন্দর জেটি ছিল। সেই জেটির গায়ে বাঁধা থাকতো ফেলে রেখে যাওয়া কিছু ফ্রিগেট আর ডেস্ট্রয়ার। বিকেলে জেটিতে আমাদের জমায়েত হত। কেষ্ট লাফ মেরে চলে যেত ফ্রিগেটে। হাতে তার রঙ বেরঙের চক-খড়ি। সেই খড়ি দিয়ে কেবিনের গায়ে কেষ্ট আঁকত কপারফিল্ডের চরিত্র, মিস্টার ক্রিকল, লুসি পেগট।

ছেলেবেলার কল্পনার সঙ্গে যে সব বই জড়িয়ে আছে, তা মন থেকে আজও ঝেড়ে ফেলা সম্ভব হয়নি। যৌবনে মন যখন উড়ু উড়ু, সদা সর্বদাই যখন দক্ষিণা বাতাস বইছে, তখন ধরা পড়লে পথের পাঁচালী, নয় আরণ্যক। সেই লবটুলিয়া, বৃক্ষ, বনজ্যোৎস্না। বিভূতিভূষণের প্রেমে পড়ে গেলুম। তাঁর লেখা সব বই পড়তে হবে। পাই কোথায়। তখনও ছাত্র। টাকা-পয়সার বড়ই অভাব। আমার এক দাদাস্থানীয় ব্যক্তির বাড়িতে বেশ কিছু বই ছিল। ছোটদের, বড়দের। সেই বইয়ের র‍্যাক থেকে একখণ্ড পথের পাঁচালী আবিষ্কার করলুম। মলাট নেই। ছিঁড়ে-খুঁড়ে গেছে। তা হোক। সেই বয়সে, সে যেন আমার আমেরিকা আবিষ্কার। বইটা বাড়িতে এনে সাবধানে পড়ে ফেললুম। সে এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। এক একটি পরিচ্ছেদের এক একটি নাম, আম আঁটির ভেঁপু, বল্লালি বালাই। অপুকে যে অনুচ্ছেদটি পণ্ডিতমশাই শ্রুতিলিখন লিখতে দিচ্ছেন—'এই সেই গিরিস্থান মধ্যবর্তী-জনপদ', সেই অনুচ্ছেদটি আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। দুপুরে চোখ বুজলেই যেন দেখতে পেতুম, নিশ্চিন্দিপুরের মাঠে অপু আর দুর্গা ছুটছে। ইন্দির ঠাকরুন ছেঁড়া মাদুর বগলে গ্রামের হাটতলা দিয়ে চলেছেন। উনুনের ছাইগাদায় বেড়াল বাচ্চা দিয়েছে রাতে। ভোরে অপুর সঙ্গে আমিও যেন শুনতে পাচ্ছি নবজাতকের মিউ মিউ ডাক। বইটাকে মেরে দেবার তালে ছিলুম। ওদিক থেকেও বইটির জন্যে তেমন কোনও তাগিদ ছিল না। ভাবলুম ছেঁড়া-খোঁড়া বই তো, দাদা আমার বেমালুম ভুলে গেছেন। বইটা আমার হয়েই গেছে ভেবে,

পয়সা খরচ করে বাঁধিয়ে আনলুম। বাঁধিয়ে আনার পর বইটা পড়তে আরও যেন ভালো লাগল। পাঁচ বছর পরে দাদা একদিন আমার বাড়িতে এলেন বেড়াতে। আমাদের বাড়িতে তাঁর প্রথম পদার্পণের আনন্দে আত্মহারা হয়ে চা, জলখাবারের ব্যবস্থার জন্যে ছোটাছুটি করছি, সেই ফাঁকে দাদা আমার বইয়ের র‍্যাক থেকে সযত্নে বাঁধানো পথের পাঁচালীটি টেনে বের করেছেন। আমি জলখাবারের প্লেট হাতে ঘরে ঢুকতেই বললেন, 'আরে এই তো আমার সেই বইটা! বাঃ বাঁধিয়ে-টাধিয়ে কি সুন্দর করেছ! থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ।'

আমার মনে হচ্ছিল খাবারের প্লেটটা নিয়ে চলে যাই। সে অভদ্রতা আর করা গেল না। চামড়ার বাঁধাই পথের পাঁচালী, স্পাইনে সোনার জলে নাম লেখা। দাদা আমার গরম সিঙাড়া খেতে খেতে বললেন, 'বই শুধু পড়লেই হয় না, যত্নও করতে হয়। তোমার যত্ন দেখে খুবই ভালো লাগল। আমার ছেঁড়া খোঁড়া বইটাকে তুমি কি সুন্দর করেছ। কেবল একটা ভুল তুমি করে ফেলেছ, নিজের নামটা লিখে ফেলেছ। খেয়াল ছিল না বুঝি? যাক ও পেট্রল দিয়ে ঘষে দিলেই উঠে যাবে।' খেয়ে দেয়ে, মুখ মুছে, তিনি উঠে গেলেন বইয়ের র‍্যাকের কাছে। এ বই টানেন, ও বই টানেন। র‍্যাকের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, আমি মুখ গোঁজ করে বসে আছি আমার জায়গায়। বসে বসে ভাবছি, মলাটটা ছিঁড়ে নিতে পারলে মনে তবু একটু শান্তি পেতুম। ঘরের ওমাথা থেকে দাদা বললেন, 'বুঝলে, চেনাজানা আত্মীয় স্বজনের বাড়ি বাড়ি ঘুরে দেখতে হয়। দেখতে দেখতে দু'একটা চোরাই বই এইভাবে বেরিয়ে আসে। জানো তো সব বাড়িতেই ফিফটি পারসেণ্ট বই চুরির। তুমি কি আর কোথাও বই রাখো?'

'কেন বলুন তো?'

'আমার আর একটা বই, যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সোনার পাহাড়, সেই বইটা কে মেরে দিয়েছে!'

পথের পাঁচালী পুনরুদ্ধার করে আমার সেই দাদা চলে গেলেন। ভাগ্যিস, সোনার পাহাড় বইটা চিলেকোঠায় রেখে এসেছিলুম।

একবার এক ভদ্রলোকের বসার ঘরের আলমারিতে অনেক ভালো ভালো বই সাজানো দেখে গৃহস্বামীকে অনুরোধ করলাম, 'আলমারিটা একবার খুলবেন ?' ভদ্রলোক বললেন, 'আজ তো খোলা যাবে না। চাবি আমার স্ত্রীর কাছে। তিনি দুর্গাপুরে চাকরি করেন। সপ্তাহে একবার আসেন, তখন খুলে ঝাড়-পোঁছ করা হয়।' জিজ্ঞেস করলুম, 'পড়েন কখন ?' বললেন, 'ওগুলো ঠিক পড়ার বই নয়।'

এমনও দেখেছি, মাপ মিলিয়ে বই কেনা হচ্ছে। স্বামী স্ত্রীকে বলছেন, 'আমার মনে হয়, খুকু এই বইটা ফিট করবে।' আমি পাশে ছিলুম। ভীষণ কৌতূহল হল। ফিট করবে মানে ? বই কি জুতো ? থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করলুম, 'কোথায় ফিট করবেন ?' তখন জানা গেল, অর্ডার দিয়ে বুক কেস তৈরী করিয়েছেন। 'ফাস্ট' তাকে বুঝলেন, এই ইঞ্চি তিনেক ফাঁক আছে। মানে ভালো ভালো যা স্টকে ছিল ঢুকিয়েছি, জাস্ট তিন ইঞ্চি মাপের একটা পেলেই টাইট।'

আমি বললুম, 'ইঞ্চি তিন মোটা মিনিমাম ষাট টাকা পড়ে যাবে। এখন বইয়ের দাম ইঞ্চি প্রতি কুড়ি টাকা যাচ্ছে। আপনি তার চেয়ে একটা গেঞ্জির বাক্সো কিনে ঢুকিয়ে দিন, কম খরচে হয়ে যাবে।'

ব্যাপার তো ওইরকমই দাঁড়িয়েছে। বিয়ের উপহারের বই কিনতে ঢুকেছেন তিন বান্ধবী। কথা হচ্ছে, 'কুড়ি টাকার মধ্যে একটা বই দিন তো !' কুড়ির মধ্যে, পনেরর মধ্যে, দশের মধ্যে। আজকাল আবার উপহার দেওয়া হয় ব্লকে। চল্লিশজনের ব্লক। পার হেড দশ। মোট চার শো। দে একটা টেবিল ফ্যান অথবা মিক্সার। বইয়ের কপাল পুড়েছে।

বিদেশে কেউ আর বই পড়বে না অদূর ভবিষ্যতে। টি. ভি দেখবে। আর ক্যাসেটে ক্লাসিক সাহিত্যের পাঠ শুনবে। আমাদের দেশেও সেই দিন আসছে। বইয়ের 'বুম' চলছে, পাল্লা দিয়ে মানুষের অবসর সময় কমছে। এখন বই দিয়ে টেবিল ল্যাম্প উঁচু করা হয়। এরপর খাটের পায়ার তলায় বই দেওয়া হবে। যাক, পিতৃপুরুষের বই তবু একটা কাজে লাগল।

ঘড়ি

আমার একটা টেবিল ঘড়ি আছে। মেড ইন জার্মানি। ঘড়িটা আমি এক স্মাগলারের কাছ থেকে কিনেছিলুম। তখন আমার খুব দুঃসময়। আমার স্ত্রী অসুস্থ। চিকিৎসার জন্যে জলের মতো টাকা খরচ হচ্ছে। তবু ঘড়িটা আমি কিনে ফেললুম। আমার স্ত্রী দোতলার ঘরে রোগশয্যায়। আর সেই বিদেশী বে আইনি মালের ব্যবসায়ী আমাদের নিচের ঘরে। তার ঝোলা থেকে ঘড়িটা বের করে টেবিলের ওপর রাখব। কালো ডায়াল। সাদা কাঁটা। অক্ষর আর কাঁটায় রেডিয়াম লাগানো। রাতে জ্বলজ্বল করে জ্বলবে। মানুষের যেমন রূপ থাকে ঘড়িরও সেই রকম রূপ আছে। কোনও কোনও ঘড়ি সুন্দরী রমণীর মতো। প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়ে যেতে হয়। টেবিলের ওপর কালো ডায়ালের ঝকঝকে জার্মান-সুন্দরীকে দেখে প্রেমে পড়ে গেলুম।

লোকটি তখন ঘড়ির গুণাগুণে ব্যস্ত। গভীর অন্ধকারে ঘড়ি জুয়েলের মতো জ্বলবে! অ্যালার্ম' আপনি দু'কায়দায় বাজাতে পারবেন। এক কায়দায় থেমে থেমে বাজবে। যত গভীর ঘুমই হোক, সে ঘুম আপনার ভাঙবেই। আর এক কায়দায় টানা বেজে যাবে। বাজতেই থাকবে। ঘুম থেকে টেনে তুলবেই তুলবে।

'দেখতে চান।' বলেই সে লোকটি পেছন দিকে কি এক কেরামতি করতেই, ঘণ্টা বেজে উঠল। বেশ জোর, যেন স্কুল ছুটির ঘণ্টা। কিছুক্ষণ বেজে থামল। আবার বাজল, আবার থামল। সারা ঘরে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি। এক পাশে আমার ধবধবে সাদা, লোমঅলা কুকুরটা ঘুমোচ্ছিল। সে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। ঘড়িটাকে ধমকাতে লাগল ঘেউ ঘেউ করে। আমার রোগ-নিস্তব্ধ বাড়িতে সহসা শব্দের আন্দোলন।

আমি বললুম, 'থামান থামান।'

লোকটি মাথার ওপর একটা বোতাম টিপতেই সারা বাড়িতে নিস্তব্ধতা নেমে এল। শুধু কুকুরটা তখনও রাগে গরগর করছে। আমি মনে মনে ভাবলুম, তুই তো কুকুর, তুই কেন, সময়ের ওপর সকলের রাগ। তোর অবশ্য বেশি রাগ হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ, তোদের আয়ু মাত্র বারো বছর। বারো বছরেই এই সুন্দর লোমঅলা নরম দেহটি ফেলে চলে যেতে হবে। ওই ঝকঝকে কালো চোখে আর দৃষ্টি থাকবে না। আমি মানুষ। আমি হয়তো সত্তরটা বছর দুঃখে-সুখে কাটিয়ে যেতে পারব। প্রায় ছটা কুকুরের পরমায়ু এক সঙ্গে করলে যা হয়। আর যত্নে তোয়াজে থাকি, আনন্দে থাকি, তাহলে সাতটা কুকুরের পরমায়ু এ যুগে কিছুই নয়। আমাদের বংশে প্রায় এক শো রান তোলার মতো ব্যাটসম্যান ছিলেন।

কুকুরটা আবার কোণের দিকে গিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস। লোকটি বললে, 'একবার একটানা বাজনাটা দেখাবো।'

আমি বললুম, 'না না, কোনও প্রয়োজন নেই!'

লোকটি ঘড়ির পেছন দিকে, ছোট্ট একটা উঁচু মতো লোহার খোঁচা দেখিয়ে বললে, 'ভেরি সিম্পল। এই দেখুন, কন্‌টিনিউ-য়াসের দিকে ঠেললে নাগাড়ে বাজাবে আর ইণ্টারমিণ্টেন্টের দিকে ঠেললে থেমে থেমে।'

বুঝলাম তার খুব ইচ্ছে হচ্ছে আর একবার বাজায়। সব মানুষের মধ্যেই শিশুটা থেকে যায়। আমের ভেতর আমের আঁটির মতো। অ্যালার্ম বাজতেই কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করেছিল, গোঁ গোঁ করেছিল। বেশ মজা লেগেছে। আর একবার খ্যাপাতে চায়। জানে না আমার বাড়িতে কি জীবন-মরণ সংগ্রাম চলেছে দোতলার ঘরে। যে কোনও মুহূর্তে আমার সবচেয়ে প্রিয়জন, আমার স্ত্রী চলে যেতে পারে। সে এখন সময়ের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। আমি তাকে বলিনি। ডাক্তার আমাকে বলে গেছেন, 'শি ইজ ব্যাটলিং উইথ টাইম। এই যে ওষুধ, এতে আরোগ্য হবে না; শুধু কিছুদিন ধরে রাখা। আজ থেকে কাল, কাল থেকে

পরশ্ন স্পষ্ট দিন গোনা। একদিন দপ করে আলো নেবার মতো দীপ নিবে যাবে।'

যে লোকটি ঘড়ি এনেছে তার সবই ভালো, কথায় কথায় সামনের দ্নটো দাঁত বের করে হাসিটা ভালো লাগে না। লোকটাকে তখন ভীষণ স্বার্থপর মনে হয়। কেনা আর বেচা এর বাইরে যেন প্ৃথিবীতে আর কিছ্ন নেই। উত্তর মের্ন, দক্ষিণ মের্নর মতো, ক্রেতার প্ৃথিবী আর বিক্রেতার প্ৃথিবী। ভালোবাসার প্ৃথিবীটা যেন উবে গেছে।

আমাদের বাড়িতে যে মেয়েটি কাজ করে, সে রাগ রাগ ম্নখে দ্ন' কাপ চা দিয়ে গেল। যাবার সময় বলে গেল, 'আপনি এখন এই ঘড়ি নিয়ে রঙ্গ করছেন। বাড়িতে তো তিনটে ঘড়ি রয়েছে। এখন এই অ্যাতো খরচের সময়?' আমাদের বাড়ির সঙ্গে মেয়েটি এমন ভাবে জড়িয়ে গেছে যে, তার এই সব কথা বলার অধিকার জন্মেছে। সবাই জানে আমাকে ট্নপি পরানো খ্নব সহজ। চকচকে ঝকঝকে জিনিসের ওপর আমার ছেলেমান্নষের মতো লোভ।

মেয়েটি যেতে যেতে দরজা পার হবার আগে ঘ্নরে দাঁড়িয়ে বললে, 'বউদি আগে ভালো হয়ে উঠ্নক না, তারপর এই সব বাজে খরচ যত পারেন করবেন।'

লোকটি সেই অদ্ভুত হাসি, সামান্য তোতলানো গলায় বললে, 'এসব ঘড়ি একবার হাতছাড়া হয়ে গেলে আর পাওয়া যাবে না। মেড ইন জার্মানি।'

লোকটিকে ভীষণ বোকা বোকা দেখালেও পাকা ব্যবসাদার। আমার বাড়ির পরিস্থিতি, তাতে কার্নর হাসা উচিত নয়, তব্ন লোকটির ম্নখের লোভী অথচ বোকা বোকা হাসি মেলাচ্ছে না। সেই হাসিটাই বজায় রেখে চায়ের কাপে ফর ফর করে চুম্নক দিল।

মেয়েটি আমার বিবেকে খোঁচা মেরে গেছে। সত্যিই তো, আমি কি বলে বাজে খরচ করতে চলেছি! এই কি সময়! ওষ্নধে-ডাক্তারে রোজ জলের মতো টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে। মেয়েটি আমার সামনে নিষ্ঠ্নর ভবিষ্যৎ মেলে দিয়ে গেছে। বউদির ভালো হওয়া।

বউদি আর কোনও দিন ভালো হবে না। খস্‌খস্‌ করে এই ঘড়ির কাঁটা চলছে। বউদির জীবন ঘড়িও চলছে। কতটা দম আছে কেউ জানে না। জীবন ঘড়ির কোনও মেকানিক নেই। নিজেই চলে, নিজেই বন্ধ হয়। স্বাধীন। বাইরে থেকে দম দেবার কোনও চাবি নেই।

'ঘড়িটার দাম কত?'

'আপনার জন্যে আমার সব সময় স্পেশাল দাম। এ ঘড়ি আপনি আর কোথাও পাবেন না।' লোকটি নিঃশব্দে হাসতে লাগল।

'দামটা বলুন।'

'কত আর, তিনটে পাত্তি দেবেন!'

'বলেন কি! একটা টেবিল ক্লকের দাম তিন শো। আপনার মাথা খারাপ!'

'এটা কোথাকার ঘড়ি দেখুন! জার্মানির। সারা জীবন চলবে।'

'আমার দরকার নেই মশাই, নিয়ে যান। আমার এখন খুব দুঃসময়। আপনার সঙ্গে ঘ্যানোর ঘ্যানোর করার সময় নেই।'

'ঠিক আছে, আমি আপনার জন্যে লোকসান করেই দেব। আপনি দুটো পাত্তি দিন।'

'দু শো! দু শো টাকার টেব্‌ল ক্লক।'

'আচ্ছা যান, একশো ষাট।'

লোকটার অদ্ভুত একটা ক্ষমতা আমি আগেও লক্ষ্য করেছি। যাকে ধরবে, তাকে বধ করে ছাড়বে। ঘড়িটা টেবিলের ওপর রেখে চলে গেল। সেই জার্মান রূপসীর দিকে তাকিয়ে আমি বেশ কিছুক্ষণ বসে রইলুম।

আমার স্ত্রীর ঘরে কোনও ঘড়ি ছিল না। বাইরের দালানে একটা ওয়াল ক্লক সারা দিন খটর খটর করত, আর সময় মতো চড়া সুরে বেজে উঠত। রাতের দিকে যখন রোগের অসম্ভব বাড়াবাড়ি, রুগী যন্ত্রণায় ছটফট করছে, সেই সময় ঘড়িতে বাজছে রাত বারোটা। ঘড়িকে তো আর থামানো যায় না। সে এক বিরক্তিকর অভিজ্ঞতা। ওই ওয়াল ক্লকটাকে আমি সরাবো।

সকালের দিকে আমার স্ত্রী ওরই মধ্যে একটু ভালো থাকে। অসুখও আলোকে ভয় পায়। দিনের আলো নিবে গেলেই দাপা-দাপি শুরু করে দেয়। আমি ঘড়িটাকে সাবধানে বুকের কাছে ধরে যখন তার ঘরে ঢুকলুম, তখন বাইরের প্রকৃতি রোদের আলোয় ঝলমল করছে। বালিশের পর বালিশ সাজিয়ে তাকে ঠেসান দিয়ে বসিয়ে রাখা হয়েছে। আমার মনে হল, আমি একটা কর্পূরের মূর্তি দেখছি। একটু একটু করে উবে যাচ্ছে। কর্পূর তার এই প্রাত্যহিক ক্ষয় জানে না। আমরা জানি। কাল যা ছিল, আজ আর তা নেই। দিন দিন সাদা, ফ্যাকাশে হয়ে আসছে, শুধু চোখ দুটো হয়ে উঠছে অসম্ভব রকমের উজ্জ্বল!

আমি বললুম, 'দ্যাখো, তোমার জন্যে একটা ঘড়ি কিনে এনেছি। ভারি সুন্দর।'

ঘড়িটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। আমি তাকিয়ে আছি তার মুখের দিকে। চোখ দুটো ধীরে ধীরে জলে ভরে উঠছে। আমার একটা অস্বস্তি শুরু হল। কোনও অন্যায় করে ফেললুম না তো! ধরাধরা গলায় সে বললে, 'সময়?'

আমি তার মনটাকে ঘুরিয়ে দেবার জন্যে বললুম, 'জার্মানির ঘড়ি। সারা জীবন নিখুঁত সময় দেবে। একটুও এদিক ওদিক হবে না।'

'সুন্দর দেখতে। ভারি সুন্দর। পৃথিবীতে কত যে সুন্দর সুন্দর জিনিস আছে!'

'এটা তোমার চোখের সামনে, এই তাকে থাকবে। তুমি বুঝতে পারবে কটা বাজল। একে ওকে আর জিজ্ঞাসা করতে হবে না, কটা বাজল।'

'একটা হিসেব, বলো?'

'কিসের হিসেব?'

'এই আর কতটা বাকি আছে!'

তখনই মনে হল, ঘড়িটা এনে আমি ভুল করেছি। যার খরচের পালা, তার সামনে এই মাপের যন্ত্র হাজির করার অর্থ, তাকে সচেতন করা। আমি বললুম, 'তুমি বড় বেশি ভেঙে পড়েছ। অসুখ কি কারুর করে না!

'তিন মাস হল।'

'হোক না, ছ মাসও হতে পারে।'

সে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। যে যাবে, সে জানতে পারে। যাত্রীর কাছে ট্রেন আসার টাইমটেব্‌ল থাকে। আমি ঘড়িটাকে সামনের তাকে রাখলুম চোখের সামনে। সেকেণ্ডের সাদা কাঁটা কালো ডায়ালের ওপর পাক মেরে চলেছে।

সেদিন রাতে ভীষণ বাড়াবাড়ি হল। অসম্ভব শ্বাসকষ্ট। একবার নিঃশ্বাস নেবার জন্যে মাছের মতো খাবি খাওয়া। নাকে অক্সিজেনের নল পুরে দেওয়া হল। ঘর ভর্তি আত্মীয়-স্বজন। রোজই আমরা দল বেঁধে রাত জাগি। আমি এক পাশে বসে ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে আছি। নটা বাজল, এগারটা বাজল। বাইরের দালানের ঘড়িতে আগেই বারটা বেজে গেল দুর্দান্ত সুরে। আমার ভাবনা হল, কোন ঘড়িটা ঠিক! বাইরেরটা না ভেতরেরটা। একশ ষাট টাকা ঠকে গেলুম! মাঝে মাঝে আমার স্ত্রীর নাক থেকে নল বের করে ইঞ্জেকসানের ছুঁচ দিয়ে ফুটো পরিষ্কার করে আবার নাকে গুঁজে দেওয়া হচ্ছে।

বাইরের ঘড়িতে একটা বাজল। ভেতরের ঘড়িতে বারটা বাজতে পাঁচ। আমি ভালো করে তাকালুম। সেকেণ্ডের কাঁটাটা ঘুরছে না। এ কি, ঘরের সময় ফুরিয়ে গেল না কি! তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ঘড়িটা তাক থেকে নামালুম। দু দিকে দুটো দম দেবার চাবি। বাঁ দিকেরটা তিন পাক ঘোরাতেই চড়া সুরে অ্যালার্ম বেজে উঠল। আমাদের কুকুরটা একপাশে পাখার বাতাসে হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমোচ্ছিল। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ঘেউ ঘেউ শুরু করল। আমার এক আত্মীয়া বিরক্তির গলায় বললেন, 'এখন ওসব থাক না।' আমার ভুলটা বুঝতে পারলুম। অ্যালার্মের দমটা দিয়ে ফেলেছি। তখন ডান দিকের চাবিটা ঘোরাতে লাগলুম কটর কটর শব্দে। কোনও দিকে আমার দৃকপাত নেই। খেয়াল নেই, একজনের সময় থেমে আসছে। যার দম হল বাতাস। সেই বাতাস টানতে পারছে না। আমার ঘড়ি আবার চলতে শুরু করেছে। দীর্ঘ, সুঠাম সেকেণ্ডের কাঁটা নেচে নেচে চলেছে। বাইরে গিয়ে সময়টা মিলিয়ে নিয়ে তাকে তুলে দিলুম। এখন

আমার শান্তি। উদ্বেগ কেটে গেছে। দুটো ঘড়িই আমার এক সময় দিচ্ছে। সকলেই আমার দিকে অবাক হয়ে তাকাচ্ছে। যার স্ত্রীর এই রকম এখন-তখন অবস্থা, সে একটা ঘড়ি নিয়ে এই রকম ন্যাকামি করছে! সময় যে একটা দীর্ঘ রাজপথের মতো। গাড়ি যারা চালায় তারা জানে, পথের খারাপ অংশটা পেরতে পারলেই আবার কিছুটা মসৃণ পথ, তখন সুন্দর পথ চলা। খারাপ সময়টা কোনও রকমে কাটাতে পারলেই আবার সুসময় আমি যে সেই দিকেই তাকিয়েই আছি। ঘড়িতে সময়ের হাত ঘুরছে। দুটো বাজল, তিনটে বাজল। আমি জানি রাতটা কোনও রকমে পার করে দিতে পারলেই, আমার স্ত্রী আবার কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠবে। গত তিনমাস ধরে রাতের অন্ধকার শক্তি জীবনের কূল থেকে অজানা সমুদ্রের কূলে নিয়ে যাবার চেষ্ট করছে।

পুবের আকাশ রক্তিম হল। আমার স্ত্রীর যন্ত্রণাকাতর চোখ দুটো সেই আকাশে। লাল। আরও লাল। অকসিজেনের নল খুলে নেওয়া হল। একজন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'ক্রাইসিস ইজ ওভার।' রাতজাগানিয়ার দল একে একে বিদায় নিয়ে চলে গেল। লাল আকাশের দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারায় আমার স্ত্রী জানাল, দিন এসেছে। রাতের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া আর একটা দিন। আমি তার পাশে বসে আছি। সে ফিস ফিস করে আমাকে বলল, 'ঘড়িটাকে একটা সুন্দর খোপ তৈরি করে এই উত্তরের দেয়ালে রেখো। বেশ দেখাবে। নারায়ণের ছবিটাকে সরিয়ে দিও পুবের দেয়ালে।' এই কথা কটি বলেই ক্লান্ত হয়ে বালিশে মাথা রাখল। বাইরে কোলাহল শুরু হয়েছে। দিনের প্রথম গাড়িটি সশব্দে চলে গেল। 'বালিশ-তুলো' হেঁকে চলেছে ধুনুরী। শীত আসছে। আমার জীবন থেকে একজন চলে যাচ্ছে। বসন্তের অপেক্ষায় সে আর থাকবে না।

আমার এই দোতলা ঘরে সবই ঠিক আগের মতোই আছে। খাট, বালিশ, বিছানা, চাদর, বইয়ের শেলফ, ছবি, দেরাজ, সব আছে। শুধু একজন নেই। সবাই প্রশ্ন করে, 'উত্তরের দেয়ালে,

তোমার অমন সুন্দর ঘড়িটা নটা পঁয়তাল্লিশ বেজে বন্ধ হয়ে আছে কেন ?' আমি পাল্টা প্রশ্ন করি, 'বল তো ওটা রাত না দিন !' সেদিন ছিল শুক্লা দ্বাদশী। রাত নটা পঁয়তাল্লিশ। সময়টাকে সময়ের স্রোতে আমি খুঁটির মত পুঁতে রেখেছি। বাইরের ঘড়িটাকে আমি সরাইনি। সেটা চলেছে। চলেই চলেছে। ওটাই আমার হিসেব। দেখতে চাই, নদীর কত দূরে এসে আর একটা খুঁটি পড়ে।

———